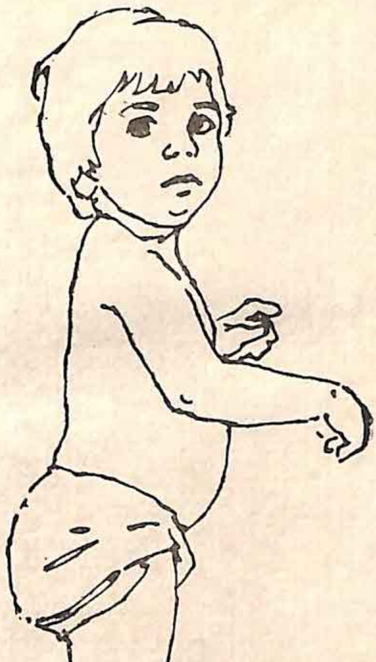
বেবী কেয়ার

ডাঃ ইন্দিরা ভট্টাচার্য এম.ডি.





বেবী কেয়ার



BABY CARE Rs. 25

By Dr. Indira Bhattacharya M. D.

Dey's Publishing, 13 Bankim Chatterjee Street

Calcutta-700073

বেবী কেয়ার

ডাঃ ইন্দিরা ভট্টাচার্য এম. ডি.

দে’ জ পা ব লি শিং ॥ ক লি কা তা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
—আশ্বিন ১৩৯০
—অক্টোবর ১৯৮৩

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
—বৈশাখ ১৩৯২
—এপ্রিল ১৯৮৫

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
—পৌষ ১৩৯৬
—জানুয়ারী ১৯৯০

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : নিতাই মল্লিক

মুদ্রাকর :
শ্রীনেপালচন্দ্র পান
সোনালী প্রেস
২/এ, ভোলানাথ পাল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

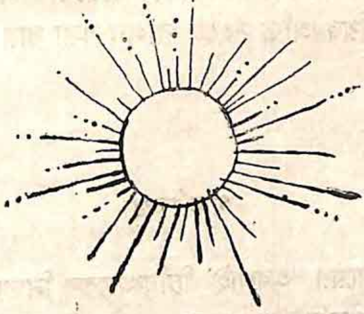
পঁচিশ টাকা
Rupees Twenty-five only

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

শিশুর আগমনের পূর্ব-প্রস্তুতি

মায়ের কোল জুড়ে প্রথম সন্তান আগমনের পূর্বে ভাবী মায়েরা অধীর আগ্রহে ফুটফুটে শিশুটির অপেক্ষায় দিন কাটিয়ে থাকেন। এ সময়ে তাঁরা বন্ধু-বান্ধবী ও আত্মীয়াদের নানা ধরনের অভিজ্ঞতার কথা শুনে কখনো কখনো উদ্বিগ্নও হন। কিন্তু অহেতুক আশঙ্কার কোন কারণ নেই। সন্তান-ধারণ আমাদের জৈবিক প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে একটি,—বহমান মানব সভ্যতার অন্যতম ভিত্তি। এর মধ্যে



কোন অস্বাভাবিকতা নেই। নবজাত শিশু যদি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, তবে তা মায়েদেরই জন্যে হয়, এর জন্যে মায়েরা গর্ববোধ করতে পারেন। আমাদের দেশে বেশীর ভাগ শিশুই প্রধানত মায়েদের সহজ ও প্রবৃত্তিগত স্নেহ এবং আদর ও যত্নে সন্তোষ-জনকভাবে বেড়ে ওঠে। জন্মের মুহূর্ত থেকে বেড়ে ওঠার সময়ে মায়ের স্বাভাবিক স্নেহ-যত্নই শিশুর পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজন, এর জন্যে বিশেষজ্ঞদের উপদেশের বিশেষ দরকার পড়ে না। শিশুর যত্নে মায়ের স্নেহের বড় কিছু নেই।

তথাকথিত উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের শিশুরা সৌভাগ্যবশত মায়েদের সহজ স্নেহ-মমতার মধ্য দিয়েই অধিক লালিত-

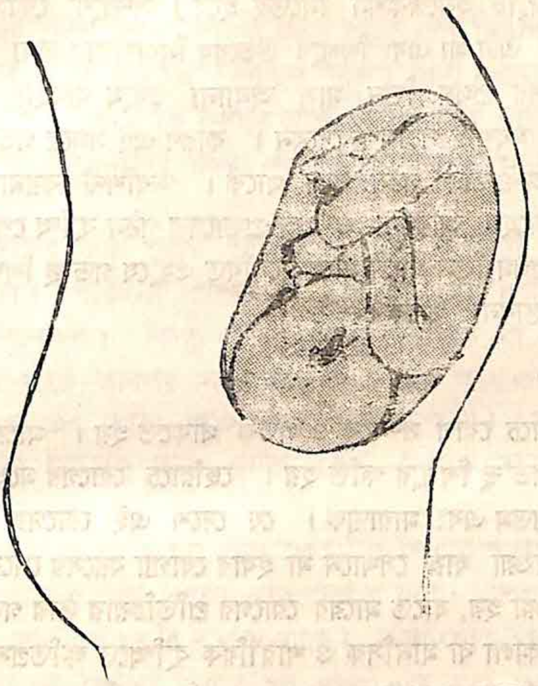
পালিত হয় এবং ধীরে ধীরে বড় হয়। বর্তমানে অবশ্য কোন কোন বাবা-মা অন্যরকম চিন্তা করছেন। তাঁরা নিজেদের বাসনা পরিতৃপ্ত করার জন্য বিশেষজ্ঞদের উপদেশ গ্রহণ করে অনেক সময় শিশুর স্বাভাবিক চাহিদার অতিরিক্ত অন্যান্য চাহিদা যা শিশুর প্রয়োজনে লাগুক বা না লাগুক তা মেটাতে আগ্রহী হচ্ছেন। অস্বাভাবিকতা কোন ক্ষেত্রেই সুখপ্রদ নয়।

তবে শিশুকে সুন্দর, সবল এবং সতেজ করে তোলার ক্ষেত্রে নতুন বাবা-মায়ের কিছু প্রাথমিক অথচ নিত্য-প্রয়োজনীয় নির্দেশিকার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দরকার আছে। অন্যথায় অনভিজ্ঞতা, হিতৈষী বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয় প্রমুখদের অতিরঞ্জিত উপদেশ ইত্যাদিতে তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতে পারেন। বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বাপর সম্যক জ্ঞান থাকলে অনেক বিপদ তারা এড়াতে পারেন। সন্তান হল বাবা এবং মায়ের মিলিত কামনার সম্পদ। সন্তান লালনপালন এবং পরিচর্যার সময় এ কথাটি মনে রাখলে অনেক দায়িত্ব অতি সহজে পালন করা যায়।

গর্ভাবস্থা

গর্ভাবস্থায় মায়ের অবশ্যই চিকিৎসকের নিত্য তত্ত্বাবধানে থাকা কর্তব্য। কারণ গর্ভবতীর স্বাস্থ্য গর্ভের শিশুর স্বাস্থ্যকে প্রতিফলিত করে। সন্তান সম্ভাবনাকালে গর্ভবতী মায়ের দেহের ওজন, রক্তের চাপ ও মূত্র নিয়মিত পরীক্ষা করাতে হয়। শরীরের অস্বাভাবিকতা, রক্তাল্পতা প্রভৃতি প্রতিরোধ করা আবশ্যক। কারণ মায়ের দেহ থেকে পরগাছার মতই শিশু তার প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে থাকে। গর্ভস্থ শিশুর উপযুক্ত প্রোটিন এবং তার দেহের অস্থি কাঠামোর পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য মাকে যথাক্রমে বাড়তি দুধ ও ক্যালসিয়াম খেতে হবে। এছাড়া চিকিৎসকের পরামর্শ মত সন্তান-সম্ভবা মায়ের প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং আয়রণ (লৌহ) গ্রহণ করা উচিত। গর্ভবতী হবার পূর্বে মায়ের দৈহিক ওজন মাত্রাধিক না থাকলে সমগ্র গর্ভাবস্থায় তাঁর ওজন ২০ পাউণ্ড বাড়ানো প্রয়োজন।

বাড়তি এই ২০ পাউণ্ড তাঁর গর্ভের শিশু, দ্রুত প্রসারিত জরায়ু, গর্ভের ফুল এবং গর্ভস্থ তরল পদার্থের ওজন।



ঘরবন্দী মায়েদের তুলনায় শ্রমজীবী মায়েদের ভূমিষ্ঠ সন্তান আকারে ছোট হতে দেখা গেছে। গর্ভবতী মায়ের বিশ্রামের প্রয়োজন আছে, কিন্তু একটানা পুরোপুরি বিশ্রাম ভাল নয়। গর্ভকালে মায়েদের সক্রিয় ও হাল্কা কাজে কর্মশীল থাকা এবং উপযুক্ত ব্যায়াম করা বিধেয়।

রোগে আক্রান্ত হবার চেয়ে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ শ্রেয়। ধনুষ্টংকার একটি সাংঘাতিক রোগ। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে নবজাতকের অকালে মৃত্যু অতীতের ঘটনা নয়। বর্তমানেও এ রোগে মৃত্যু ভয়ংকর আকারে হামেশাই হয়ে থাকে। এই রোগের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকার জন্যে গর্ভবতী মায়েদের প্রস্তুতি নিতে হয়। গর্ভে সন্তান সম্ভাবনার পূর্বে যদি কোন কারণে ধনুষ্টংকার- প্রতিষেধক ইনজেকশনের কোর্স (মোট তিনটি ইনজেকশন) মায়ের নেওয়া থাকে তবে গর্ভবতী হবার পর কেবলমাত্র

তার বুষ্টারডোজটি নিলেই চলে। যাঁদের ঐ কোর্স নেওয়া হয়নি, তাঁরা প্রথম গর্ভাবস্থাতেই ধনুষ্টংকার-এর প্রতিষেধক ইনজেকশনের (অন্তত দুটি ইনজেকশন নিতেই হবে) সম্পূর্ণ কোর্সটি গ্রহণ করবেন। এটা মা এবং শিশুর উভয়ের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন। গর্ভ-ধারণের প্রথম তিন মাস অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার না করতে চিকিৎসক অবশ্যই পরামর্শ দেবেন। কারণ এই সময়ে গর্ভস্থ শিশুর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন হয়ে থাকে। অবশিষ্ট কয়মাসে কেবল শিশুর দেহের আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সুতরাং প্রথম তিন মাসে মায়ের সেবিত ওষুধে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে।

ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হয়। মায়ের ছোঁয়াচে রোগেও গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হয়। ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে 'জার্মানী হাম' অন্যতম এবং মারাত্মক। যে দেশে এই রোগের প্রতিষেধক টীকা পাওয়া যায় সেখানে মা হবার যোগ্যা বয়সের মেয়েদের টীকা দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে মায়ের রোগের প্রতিক্রিয়ার তার গর্ভস্থ সন্তান অন্ধ ও কালা বা মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধিতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কারণ গর্ভধারণের প্রথম অবস্থায় মায়ের 'জার্মানী হাম' হলে সন্তানের বিপদ বেশি।

সদ্য ও কচি সন্তানের জন্য ভাবী মায়ের স্তনের বোঁটাকে উপযুক্ত-ভাবে তৈরী করতে হয়। অনেক নারীর স্তনের বোঁটা ভিতরে ঢোকান থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগেই এই ঢোকান বোঁটাকে উন্নত করার জন্য ক্রীম দিয়ে মালিশ করতে হয়। ঢোকান বোঁটা শিশুর স্তন্যপানে অসুবিধা ঘটায়। ক্রীম মালিশ করলে বোঁটা মসৃণ হয়। স্তনের বোঁটা শুকনো, রুক্ষ বা কড়কড়ে থাকলে প্রথম প্রথম স্তন্য-পানের সময় শিশুর নরম ঠোঁটে বোঁটায় চিড় ধরে, মায়ের তাতে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তাই মায়ের নিজের এবং শিশুর উভয়ের জন্যেই স্তনের বোঁটার প্রতি ভাবী মাকে যত্ন এবং লক্ষ্য রাখতে হয়। সন্তান প্রসবের পূর্বেই এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়।

শিশুর জন্য প্রস্তুতি

আমাদের দেশে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে তার নিরাপত্তার জন্য কোন প্রকার প্রাক্-প্রস্তুতি নেওয়ার বিষয়ে নানা ধরনের সংস্কার প্রচলিত আছে। এমন কি শিশুর জন্মের পরও প্রথম কয়েক সপ্তাহ নতুন পোষাক, বিছানাদির ব্যবস্থা করাতে মহা আপত্তি আছে।

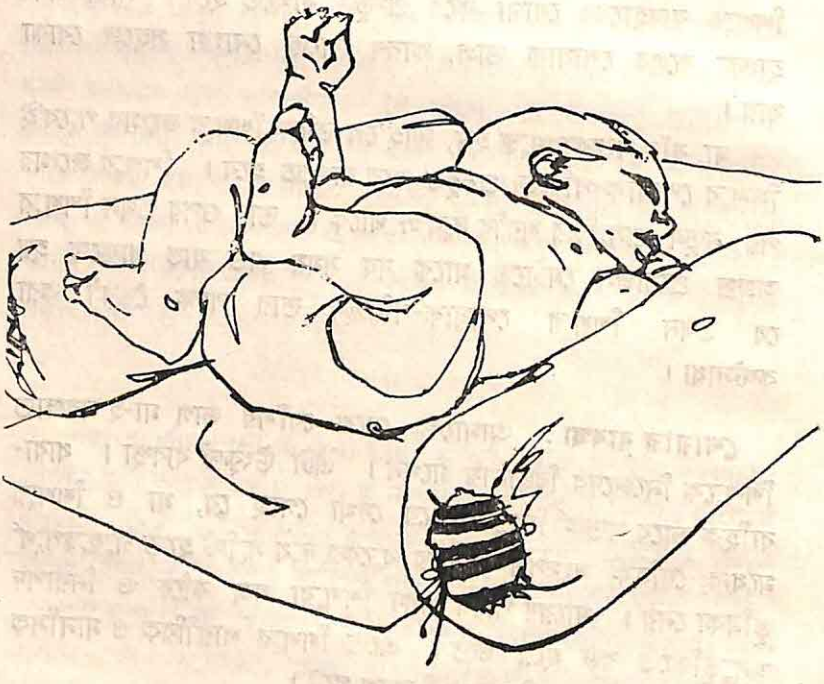
নবজাতকের জন্য দেশে প্রচলিত পুরানো কাপড়ের পোষাকই সবচেয়ে ভাল। পুরানো কাপড় ও তার ছোট ছোট পোষাক নরম এবং জল-বিশোষক। কিন্তু এই পুরানো পোষাক বা কাপড়কে ভালোভাবে ধুয়ে তারপর সম্ভব হলে দশ মিনিট গরম জলে ফুটিয়ে শিশুর ব্যবহারের যোগ্য করে প্রস্তুত রাখতে হবে। সাদা এবং হাল্কা রঙের পোষাক ভাল, কারণ তাতে নোংরা সহজে বোঝা যায়।

মা যদি সংস্কারমুক্ত হন, তাহ'লে তাঁকে শিশুর জন্মের পূর্বেই শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে রাখতে হবে। শিশুর জন্মের পর নতুন প্রসূতির শরীর দুর্বল থাকে। তার ওপর তখন শিশুর অজস্র প্রয়োজন মেটাতে মাকে সব সময় এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে তখন শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদ তার পক্ষে তৈরী করা কষ্টসাধ্য।

শোয়ার ব্যবস্থা : আমাদের দেশে বেশির ভাগ মা-ই নবজাত শিশুকে নিজেদের বিছানায় রাখেন। এটা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। ধারা-বাহিক ভাবে সতর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, মা ও শিশুর মধ্যের দৈহিক সংস্পর্শ মায়ের বুকের দুধ সৃষ্টি হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। মায়ের পাশে থাকা শিশুরা কম কাঁদে ও নিরাপদ অনুভূতিতে বড় হয়ে ওঠে। এতে শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ ঘটে।

কিন্তু মায়ের শোয়া যদি ভাল না হয়, কিংবা তাঁরা শিশুর সঙ্গে শুতে অসুবিধা বোধ করেন, তবে রাত্রে বেবী-খাট ব্যবহার করা উচিত। যতদিন পর্যন্ত না শিশু গড়াতে পারে, ততদিন পর্যন্ত যে কোনও খাটেই শিশুকে শোয়ানো যায়। সেই খাটের জন্য চাদরে

ঢাকা তোষক প্রয়োজন। এমনি চাদর অন্ততপক্ষে তিনটি থেকে ছয়টি থাকা দরকার যাতে ময়লা হলে ধোয়া ও শুকানোর অবসর পাওয়া যায়। আমাদের দেশের কাঁথার ব্যবহার চমৎকার। পশ্চিমীরাও তা ব্যবহার করলে ভাল হ'ত। পুরানো কাপড়ের ওপর পাড়ের মসৃণ সুতো দিয়ে তৈরী হওয়ায় এই কাঁথা বড় নরম ও বিশোষক হয়। নরম কাঁথায় শিশুকে জড়ানো সহজ ও শিশুর পক্ষে আরামপ্রদ। শিশু প্রস্রাব করলে কাঁথা সহজে শুষে নেয় বলে তার নরম চামড়ায় জ্বালা হয় না। প্লাস্টিকের সীট ব্যবহারের এই সমস্যা দেখা যায়। ধোয়া কাচা শুকানোর জন্য কাঁথা কিন্তু সংখ্যায় যথেষ্ট প্রয়োজন।

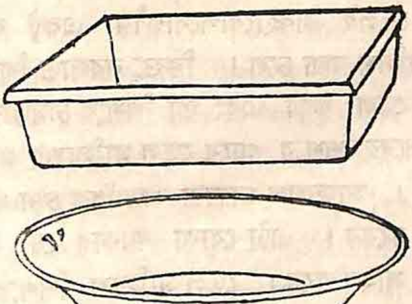


শিশুর মাথায় বালিশের দরকার হয় না। প্রকৃত পক্ষে মাথার বালিশ ব্যবহার উচিতও নয়। তবে পাশ বালিশের ব্যবহার উপযোগী।

রাবার ক্লথ বা প্লাস্টিক সীট : যতদিন শিশু গড়িয়ে চলতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত তোষকের ওপর বার ইঞ্চি দীর্ঘ নয় ইঞ্চি প্রস্থ রাবার ক্লথ বা প্লাস্টিকের সীটে বাচ্চার দেহের তলাকার আচ্ছাদনের ওপর পেতে দিতে হবে যাতে সমস্ত বিছানার চাদর এবং তোষক নষ্ট না হয়। কিন্তু কখনই সরাসরি রাবার ক্লথ বা প্লাস্টিকের ওপর বাচ্চাকে শোয়াতে নেই। তোয়ালে, কাঁথা, পুরানো কাপড় ভাঁজ করে অথবা অন্য কোনও আচ্ছাদন এ রাবার ক্লথ ও প্লাস্টিক সীট ঢেকে শিশুকে শোয়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। রাবার ক্লথ ও প্লাস্টিকের সীটে সরাসরি শোয়ালে শিশুর দেহে মলমূত্র লেগেই শুধু যায় না, ঘামে ঘামে ও মলমূত্রে ঘামাচি বা ঐ জাতীয় গুটি বাচ্চার দেহে ভরে যাবে। সুতরাং রাবার ক্লথও প্লাস্টিকের জন্য ছয় বা ততোধিক কাপড়ের ঢাকনা দরকার।

কম্বল : শীতের সময় শিশু জন্মগ্রহণ করলে কম্বল বা পাতলা লেপের প্রয়োজন হয়। পুরানো গরম শাল (গায়ের চাদর) ধুয়ে ভাঁজ ভাঁজ করে শিশুর দেহ আবৃত করলেও খুব ভাল হয়। কম্বল বা শাল ঘন ঘন কাচা সহজ নয়। তাই কম্বল ও শালের তলায় সুতীর চাদর ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি লেপের মত কম্বল বা শালে ওয়াড় পরানো যায়। এক রকম ব্যবস্থা অন্তত দুটি রাখলে পর্যায়ক্রমে কাচা ও শুকিয়ে নেওয়া সহজ হবে।

স্নানের জন্য গামলা বা বাথ টাব : সুবিধাজনক যে কোনও



পরিষ্কার পাত্রে শিশুকে স্নান করানো চলে। যদি নতুন বাথ-টাব

কিনতে হয়, তবে ছোট কেনা ঠিক নয়। একটু বড় দেখেই তা কেনা উচিত যাতে শিশু বড় হয়ে যখন বসতে পারবে তখন জল নিয়ে চারদিকে খেলা করতে পারে। প্লাস্টিকের বাথ-টাব হাল্কা এবং সস্তা। অবশ্য এনামেল বা অন্য ধাতুনির্মিত বাথ-টাব পরিষ্কার করা সহজ।

বালতি: সম্ভব হলে শিশুর প্রয়োজনে দুটি বালতি রাখা ভাল। একটি বালতি ভিজে কাঁথা, চাদর, তোয়ালে প্রভৃতি রাখার এবং অপরটি ব্যবহৃত, ময়লা (মলমূত্রে) কাঁথা-চাদর তোয়ালে রাখার জন্য। সেক্ষেত্রে ময়লা হয়ে যাওয়া কাঁথা তোয়ালের নোংরা অন্য বালতিটিতে লাগবে না। বাচ্চার ব্যবহৃত ঐ সব পরিচ্ছদ বালতিতে রাখার সময় কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখলে ময়লা আলগা হবে এবং পরিষ্কার করা সহজ হবে।

শিশুর সাবান: যে কোনও কোমল সাবান শিশুর জন্য ব্যবহার করা চলে। গরম আবহাওয়ায় শিশুর আর্দ্র দেহে সহজেই রোগ-জীবাণু সংক্রামিত হওয়ায় ঘামাচি বা ফুসকুড়ি জন্মায়। তখন সিনথল জাতীয় হেক্সাক্লোরোফেন যুক্ত সাবান খুব কার্যকরী হয়। একই কারণে শিশুর স্নানের জলে ক্লোরহেকসাডাইন যুক্ত লোশন, যেমন স্যাভলন ব্যবহার করা যেতে পারে।

মালিশের তেল: শিশুর গায়ে মালিশের জন্য যে কোনও কোমল খাঁটি তেলই ব্যবহারোপযোগী। একটু বড় শিশুর গায়ে সরষে তেল মালিশ করা চলে। কিন্তু নবজাত শিশুর নরম চামড়ার পক্ষে সরষে তেল কড়া এবং তা শিশুর চামড়ায় জ্বালাও ধরায়। আমাদের মায়েদের শিশুর গায়ে তেল মালিশের ওপর খুব আগ্রহ ও বিশ্বাস আছে। আজকাল মায়েরা অত্যধিক চড়া দামে বিদেশী তেল কিনে মালিশ করেন। এটা বোঝা দরকার যে, যে কোনও তেলই একই উদ্দেশ্য সাধন করে। তেল মালিশে শিশুর চামড়া শুকনো হওয়া প্রতিরোধ করে মাত্র। তেল কিছু শিশুর দেহে ঢুকে দেহকে শক্ত করে না, যা সাধারণের বিশ্বাস। অবশ্য শিশুরা মালিশে আরাম পায় এবং সেইদিক থেকে শিশুকে তেল মালিশ করা নিশ্চয়ই

ভাল। কিন্তু বাচ্চারা হাত ছোঁড়াছুঁড়ি করে পা দিয়ে বিছানা লাথি মেরে নিজেরাই তাদের মাংসপেশী শক্ত-সবল করে তোলে।

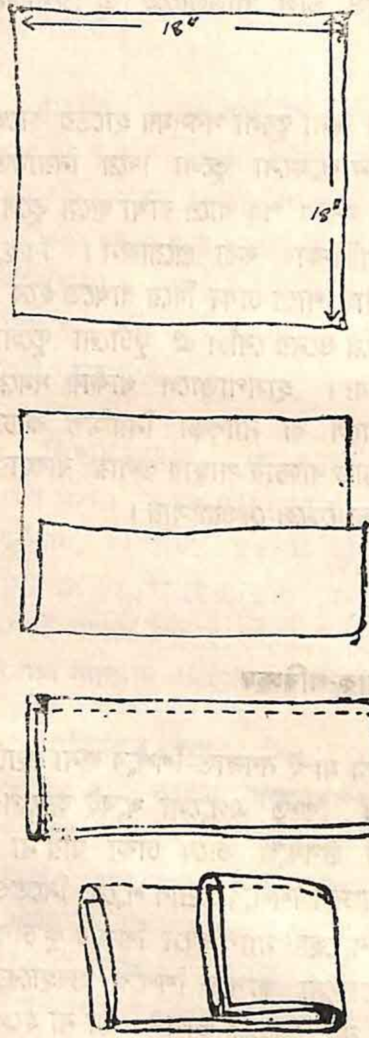
বেবী পাউডার : শিশু-দেহের স্যাঁতসেতে ভাবকে পাউডার শুষে নিয়ে ঝরঝরে রাখে। যে কোনও ভাল পাউডারেই এ প্রয়োজন মিটতে পারে।

তুলো : শিশুদের ব্যবহারের জন্য তুলো সবসময় হাতের কাছে রাখতে হবে। শিশুর নাক ও কান শুকনো তুলো দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। পায়খানা করার পর পাত্রে রাখা জলে তুলো ভিজিয়ে নিখুঁতভাবে শিশুকে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। কিছু তুলোর দলা জলে ফুটিয়ে একটা ছোট পাত্রে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। প্রতিবার শিশুকে বুকের দুধ খাইয়ে স্তনের বোঁটা ঐ ফুটানো তুলো দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা কর্তব্য। হাসপাতালে থাকার সময়ে বাচ্চার ব্যবহৃত ন্যাপকিন, তোয়ালে বা ন্যাকড়া নিয়মিত কাচা অসুবিধাজনক। তখন তুলোর প্যাড বাচ্চার পাছার তলায় ব্যবহার করলে ময়লা হবার পর অনায়াসে তা ফেলে দেওয়া যায়।

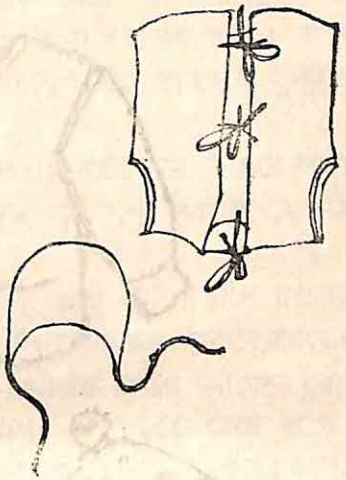
শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদ

বেবী ন্যাপকিন : বেশির ভাগ মা-ই নবজাত শিশুর জন্য ছোট ত্রিকোণ ন্যাপকিন তৈরী করেন। কিন্তু এগুলো খুবই অনুপ-যোগী। এতে প্রয়োজনীয় জায়গা উপযুক্ত ভাবে ঢাকা যায় না। এই ধরনের ন্যাপকিনের পাতলা আস্তরণ শিশুর প্রস্রাব শুষে নিতেও পারে না। অনেক সময় ঐ ত্রিকোণ ছোট ন্যাপকিনে শিশুর কুঁচকি কেটে যায়। যথেষ্ট পরিমাণে পুরানো কাপড় শিশুর ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা ভাল শুধু নয়, সবচেয়ে ভাল। তা না হলে ন্যাপকিন যদি অগত্যা তৈরি করতে হয়, তবে তা আকারে বড়, ১৮ ইঞ্চি লম্বা ১৮ ইঞ্চি চওড়া কাপড়ে করতে হবে। সংখ্যায় অন্তত দুই ডজন করতে হবে যাতে শিশুর কাঁথায় শোয়ার বয়স পার হয়। ন্যাপকিনের কাপড় নরম এবং জল বিশোষক হওয়া প্রয়োজন।

এর জন্য মোটা মলমল কাপড় ব্যবহার করা যায়। পুরানো ধুতি বা শাড়ী হলে তো চমৎকার। সেগুলো যেমন নরম, তেমনি কয়েক ভাঁজ করে ন্যাপকিন করলেও ভারী হবে না, প্রস্রাবও ভাল করে শুষে নেবে। ন্যাপকিনের কিনারা গুলোতে হেম সেলাই দিলে মজবুত হবে। নকশায় দেখানো চিত্র অনুসারে ১৮ ইঞ্চি বাই ১৮ ইঞ্চি কাপড়কে প্রথমে একদিকে সমানভাবে ভাঁজ করে পরে অপর দিকেও ভাঁজ করলে মোট তিন ভাঁজ হবে। শিশুর পিছন দিকের সমান চওড়া হবে এটা। শিশু যত বড় হতে থাকবে, তত ভাঁজ খুলে খুলে ব্যবহার করা যাবে। আস্তে আস্তে এমন হবে যখন কেবলমাত্র দুটো ভাঁজই থাকবে। শিশু যদি ছেলে হয়, তবে সামনের অংশ পুনরায় এক তৃতীয়াংশ ভাঁজ করে নিতে হবে। আর শিশু যদি মেয়ে হয়, তা হলে পিছনের অংশ এক তৃতীয়াংশ ভাঁজ করতে হবে। কারণ ছেলেদের সামনের এবং মেয়েদের পিছনের দিক প্রস্রাবে ভেজে।



ভাঁজ করা ন্যাপকিনের ওপর শিশুকে শুইয়ে ভাঁজ করা কাপড়ের অর্ধেক শিশুর দুটি উরুর মধ্য দিয়ে উঠিয়ে পিছনের কোণা দুটিকে সামনের ভাঁজ করা কাপড়ের কোণা দুটির সঙ্গে দুটো সেফ্‌টিপিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। যতটা জটিল শোনাচ্ছে ব্যাপারটা মোটেই কঠিন বা জটিল নয়। খুবই সহজ এবং সরল। শিশু যত বড় হতে থাকবে, ন্যাপকিনের সাইজ প্রয়োজনমত বাড়াতে পারা যাবে এবং ভাঁজও দরকার মত বাড়ানো-কমানো সম্ভব হবে। সেফ্‌টিপিন দিয়ে আটকাবার সময় ন্যাপকিন ঢিলে রাখতে হবে যেন কোনও ভাবেই শিশুর কুঁচকি কেটে না যায় যেমন ত্রিকোণ ন্যাপকিনের বেলায় কুঁচকি কেটে যাওয়ার ঘটনা ঘটে থাকে। শিশুদের ব্যবহারের জন্য বিশেষ সেফ্‌টিপিন আজকাল কিনতে পাওয়া যায়। এই সেফ্‌টিপিন ব্যবহার করলে কোন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ এই সেফ্‌টিপিনের বিশেষ ধরনের গার্ড থাকে যাতে হঠাৎ পিনটি খুলে যেতে পারে না।



শিশুর অন্যান্য পোষাক ব্যবহার আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে। যদি গরমকালে শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহলে মাত্র কয়েকটি সুতীর জামাতেই চলে। কেনা তৈরী পোষাক আকর্ষণীয় বটে কিন্তু তার শক্ত কুঁচি, ফিতে ও বোতাম বাচ্চার পক্ষে কষ্টকর। তার চেয়ে কম কুঁচি ও জোড়া দেওয়া এবং বোতাম ছাড়া জামা শিশুর পরিধানের জন্য বেশি আরামপ্রদ। জামার পিছন দিকটা পুরো খোলা থাকলে জামা পরানো ও খোলা সহজ, হাত ধরে টানাটানি করতে হয় না এবং মাথা দিয়ে গলানোর জন্য কসরৎ করতেও লাগে না। নমুনা-চিত্রে (আগের পাতায়) দেখানো শিশুর পোষাক প্রথম কয়েক মাস খুব উপযোগী ও সহজসাধ্য। কাপড়ের ফিতে দিয়ে দুটো দিক

বাঁধাও যায় অথবা জামাটিকে দিয়ে শিশুকে কেবল জড়িয়েও রাখা যায়।





রেডিমেড হোক বা বাড়িতে তৈরী পোষাক হোক, শিশুর জন্য যে কোনও পোষাক ব্যবহারের আগে গরম জলে ফুটিয়ে ধুয়ে নিলে খুব ভাল হয়।

শীতের সময় হলে ফ্ল্যানেল বা উলের জামা প্রয়োজন। বোনা উলের কোট সামনের দিকে খোলা রেখে বোতাম লাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কখনই মাথা দিয়ে খোলা বা পরানোর ব্যবস্থা করা উচিত নয়।

শিশুর মাথা তার দেহের একটা বড় অংশ, ফ্ল্যানেলের বা উলের বোনা টুপি দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে হবে। কাপড় দিয়ে ঢাকা তুলোর টুপি পরানো ঠিক নয় কারণ তা কাচা যায় না। শিশু যতদিন পর্যন্ত পা দিয়ে লাথি দিয়ে গায়ের ঢাকনা ফেলে দিতে না

পারে, ততদিন পর্যন্ত উলের মোজা পরালে মলমূত্রে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্লাস্টিকের প্যাণ্টি বাইরে বেরোবার সময়ে কেবল ব্যবহার করা যেতে পারে। প্লাস্টিকের প্যাণ্টি ব্যবহার না করা বরং ভাল। কারণ প্লাস্টিক মলমূত্র শুষে না নেওয়ায় শিশুর দেহে তা লেগে ফুসকুড়ি জন্মাতে পারে।

শিশুকে খাওয়াবার সময় বীব ব্যবহার করতে হবে। পরে অবশ্য তার লালা ঝরবে। খাওয়াবার পর ওক করে শিশু কিছুটা দুধ তুলে ফেলে।

একথা মনে রাখতে হবে যে বেশির ভাগ হাসপাতালে নবজাত শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদ এবং তাকে শোয়াবার জন্য বস্ত্রাদি সরবরাহ করে না। আর এই সময়েই শিশুর ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হবার আশংকা বেশি। হাসপাতাল রোগের জীবাণুতে ছেয়ে থাকে। সুতরাং হাসপাতালে ভর্তি হবার সময় শিশুর জন্য পরিষ্কার কাপড় ও পোষাক পরিচ্ছদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে যাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুকে খাওয়ানো

বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা: মা ও শিশুর পক্ষে বুকের দুধ খাওয়ানো ও খাওয়ার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক মায়েরই প্রথম কয়েকমাস শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবার দৃঢ় সংকল্প থাকা বাঞ্ছনীয়, কখনও কোন মায়ের এ ব্যাপারে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। বুকের দুধ ব্যবহারে মা ও শিশু দু'জনেরই মানসিক তৃপ্তি ঘটে। মায়ের বুকের দুধ খেয়ে কচি শিশুর মনে নিরাপত্তা বোধ আসে এবং মায়ের সঙ্গে তার নৈকট্য ঘনিষ্ঠ হয়, কৃত্রিম পদ্ধতিতে দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে তা কখনই হয় না। মায়ের পক্ষে বুকের দুধ খাওয়ানো কম ঝঞ্ঝাটের, বুকের দুধে কোন জীবাণু থাকে না, তা সর্বদাই উষ্ণ এবং ক্রন্দনরত ক্ষুধার্ত শিশুকে খাওয়াবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। সেজন্য ছোটাছুটি করে বোতল ও জল ফোটাবার, দুধ তৈরী করবার এবং তারপর তাকে প্রয়োজনমত ঠাণ্ডা করবার দরকার হয় না। মায়ের-দুধ-খাওয়া শিশুর খাবার দেরিতে পাওয়ার ব্যর্থতায় নিরাশ হতে হয় না। সে জানে যখনই তার ক্ষিধে পাবে তখনই সে মায়ের নিরাপদ কোলে স্থান পাবে, আর পাবে মায়ের উষ্ণ স্তন্যদুধ। সেই দুধ যতক্ষণ তার প্রয়োজন হবে ততক্ষণ মনের শান্তিতে পান করবে। নবজাত শিশুর পক্ষে সর্বপ্রধান প্রবৃত্তিগত চাহিদা স্তন চোষাতেই পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত হয়। কারণ যতক্ষণ খুশী সে মায়ের স্তন চুষতে পারে, চুষে চুষে দুধ খেতে পারে। বোতলের দুধে এটি হয় না। বোতলের বোঁটার ছিদ্র বড় হলে শিশুর পরিতৃপ্তির আগেই দুধ দ্রুত শেষ হয়ে যায়, আবার ছিদ্র সরু হলে টানতে টানতে শিশু ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনের সুখে দুধ সে খেতে পারে না। এতে তার মনে হতাশা আসে। অনেকের বিশ্বাস যে, মায়ের-দুধ-খাওয়া শিশুদের চেয়ে বোতলে দুধ-খাওয়া শিশুরা অনেক বেশি

আঙুল চোষে, কারণ প্রথম কয়েকমাস চুষে তার পান করার চাহিদা বোতলে মেটাতে পারে না।

শিশুর ওই মানসিক তৃপ্তি ছাড়াও বুকের দুধ উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর উপাদানে সমৃদ্ধ। এই দুধ শুধু জীবানুমুক্ত নয়, এর বিভিন্ন উপাদান রোগ সংক্রমণকে প্রতিরোধও করে। উপরন্তু মায়ের রোগ প্রতিষেধক শক্তি নবজাত শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। পোলিও মাম্‌স, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধক্ষমতা মায়ের বুকের দুধের মধ্যে দিয়ে শিশুর মধ্যে যায়। সন্তান জন্মের পর প্রথম কয়েক-দিন জলের মতন যে বুকের দুধ বের হয় তাকে 'কোলোষ্ট্রাম' বলে। 'কোলোষ্ট্রাম'-এ প্রচুর শ্বেত-রক্তকণিকা থাকায় তা রোগ সংক্রমণকে প্রতিহত করে। সুতরাং সম্পূর্ণ বুকের দুধে পালিত শিশু খুব কমই পেট বা বুকের সংক্রামক অসুখে ভোগে। গরুর দুধেই এলার্জি হতে দেখা যায় এবং তাতে শিশুকে নিদারুণ দুর্দশায় পড়তে হয়, তা সামলানো অনেক সময়ে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ মায়ের বুকের দুধে কোন এলার্জি হয় না। যদি বা অন্য কোন কারণে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোতে শিশুর ক্ষতি হবার আশংকা থাকে তখন চিকিৎসকের পরামর্শ ও সাহায্য নিতে হয়।

অনেক মা তাঁদের বক্ষ-সৌন্দর্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়। শিশুকে স্তন দান পর্যায়ে মায়েদের ক্ষয় হয় না। এ সময়ে মায়ের দেহের প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের ক্ষয় হয় সেইজন্য মাকে রোজকারের খাদ্য একটু বেশী পরিমাণে খেতে হবে এবং তারসঙ্গে আধ লিটার দুধও খাওয়া উচিত। **বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর আগে মায়ের এক গ্লাস জল বা তরল পানীয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।**

কোনও কোন মা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে তাঁদের বুকের গঠন আলগা হয়ে পূর্বেকার আকার হারাবে বলে আশংকা করেন। স্তন গঠনের ক্ষেত্রে দুধ উৎপন্নকারী গ্ল্যান্ডগুলি অতি ক্ষুদ্র অংশ এটা মনে রাখা উচিত। চর্বিপূর্ণ কোষ দিয়েই স্তনের অধিকাংশটাই

তৈরী। যা হোক, স্তনের এই দুধ উৎপন্নকারী গ্লাণ্ডগুলি স্তনে দুধ আসার সময়ে সংখ্যা ও আকৃতিতে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং স্তনও ভারী হয়। স্তন ভারী হবার পর যদি তার চামড়াকেও বেড়ে যেতে দেওয়া হয়, তবে পরবর্তীকালে স্তনের আকার প্রকৃতই পালটে যাবে। তার জন্য এ সময়ে স্তনের চামড়া ও কোষগুলির বিস্তৃতিকে ঠেকানোর জন্যে স্তনদ্বয়কে ঊর্ধ্বমুখী রাখার উপযোগী বক্ষাবরণ ব্যবহার করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু গর্ভাবস্থায় এবং শিশুর দুধ খাওয়ার মাস-গুলিতে যদি অতিরিক্ত চাপা বক্ষাবরণী ব্যবহৃত হয় তবে তা আরও ক্ষতিকর।

ঘুমের (সেডেটিভ) এবং কোষ্ঠশোধককারী ওষুধ (পার্গেটিভ) এ সময়ে খাওয়া ভাল নয়। এই ওষুধ বুকের দুধে ক্ষরিত হয়ে শিশুর ক্ষতিসাধন করে। আবার মা টমেটো, পেঁয়াজ কপি এবং অত্যধিক মসলা খেলে শিশুর পায়খানা নরম হবে। তাই কিছু-দিনের জন্য এগুলি খাওয়া থেকে মায়েদের বিরত থাকা উচিত। বীটের তরকারী মা খেলে শিশুর প্রস্রাব লালচে হতে পারে, কিন্তু তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।

অপ্রতুল বুকের দুধ : সত্যি কথা বলতে কি বুকের দুধ বাড়াতে পারে এমন কোন ওষুধ বা পথ্য সত্যিই জানা নেই। সম্ভবত পর্যাপ্ত ক্যালোরী ও বিশেষ করে কার্বোহাইড্রেট থেকেই বেশি দুধ পাওয়া সম্ভব। অনেকে বলেন, বেশি সাগু খেলে বেশি দুধ আসে এ কথাটা সত্যি হলেও হতে পারে। তবে বুকের দুধের পরিমাণ বাড়ানোর একমাত্র কার্যকরী উপায় হলো, ক্রমাগত বুকের দুধ বের করে দেওয়া। বুকের দুধের পরিমাণ কমে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে—শিশুকে ঠিকমত বুকের দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস না করা, প্রথম প্রথম মায়েদের ধারণা হয় তাঁর বুকের দুধ বোধ হয় খুবই অল্প বা খুব বেশি পাতলা। কিন্তু জানা বিশেষ দরকার যে প্রথম প্রথম শিশুর পুষ্টির দরকার হয় খুবই কম। প্রথম কয়েকদিন দুধের পরিমাণ কম হলেও পুষ্টির দিক থেকে এই দুধ খুবই মূল্যবান। যদি মনে হয় দুধ কম হচ্ছে, তাহলে অল্প ব্যবধানে শিশুকে দুটি বুকের দুধই খাওয়ানো উচিত। বার বার যদি বুকের

দুধ নিঃশেষ করে শিশুকে খাওয়ানো যায়, তাহলে দেখা যাবে যে অচিরেই শিশুর প্রয়োজনমত পর্যাপ্ত দুধ বুকে জমা হচ্ছে, প্রথম দিকে বুকের দুধ খাওয়ানোর পরও যদি শিশুর খিদে না মেটে তাহলে তাকে ফোটানো জল কিছুটা খাওয়ানো যেতে পারে। এর ফলে শিশু তার প্রয়োজনীয় তরল পদার্থটুকু পেলেও, খিদে থেকে যাওয়ার জন্য পরের বার সে খুব জোরে জোরে টানতে থাকবে, বোতল থেকে দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা থাকলে শিশুর ধারণা হবে খিদে পেলে সহজেই খাবার যখন মিলছে, তখন কষ্ট করে মায়ের বুক থেকে দুধ টানার দরকারটা কি ?

অনেক মাতা-পিতার ধারণা আছে যে শিশুর পক্ষে বুকের দুধ যথেষ্ট নয়। কৌটার দুধের ব্যাপক প্রচার ও সহজলভ্যতা তাদের এই বিশ্বাস এনে দেয়। বুঝিবা বোতলের দুধ খেতে না দিয়ে তাঁরা শিশুর প্রতি অবিচারই করছেন। এই সব বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত না হয়ে যে সব মাতাপিতা বুকের দুধের উপকারিতার ব্যাপারটা বোঝেন তারাই হলেন প্রকৃত হিতৈষী মাতা-পিতা।

অবশ্য অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে যে প্রকৃতই মায়ের বুকে পর্যাপ্ত দুধ নেই। শিশুর জন্মের সময়ে হয় মা অথবা শিশু যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লেই সচরাচর এই অবস্থা হতে পারে। মায়ের ওপর বেশি কাজের চাপ বা উৎকণ্ঠার জন্যও দুধ কম হতে পারে, এক্ষেত্রে দুধ ফুরিয়ে গেলেও কোন কোন শিশু টানতেই থাকে আবার কোন কোন শিশুর ক্ষিদে না মেটার দরুন খাবার পরই কাঁদতে শুরু করে। এইসব শিশুর কোনমতেই স্বাভাবিক পরিমাণে ওজন বাড়ে না। এই অবস্থায় শিশুকে ঘন ঘন অর্থাৎ দু'ঘণ্টা অন্তর বুকের দুধ দেওয়া উচিত। বুকের দুধ সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বোতল দেওয়া ঠিক হবে না। বোতল থেকে খাওয়া দুধের পরিমাণ থেকেই বোঝা যাবে যে, বুকের দুধ কতটা কম হচ্ছে বা হচ্ছে কি না, যদি বারবার এইভাবে শিশুকে বুকের দুধ দেওয়া যায়, তাহলে বুকের দুধের পরিমাণ যেমন বাড়ার সম্ভাবনা থাকে তেমনই মা ও শিশুর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হতে পারে। বুকের দুধের উপকারিতাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না।

বুকের দুধের আধিক্য : এর বিপরীত সমস্যা কিছু মায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়। অত্যধিক দুধ জমাট বেঁধে চাক হয়ে তাদের স্তন শক্ত হয়ে পড়ে। এতে যন্ত্রণা হয়। সাধারণত বাচ্চা যদি নির্দিষ্ট দিনের অনেক আগে জন্মায় (প্রিম্যাচুওর বেবী) বা যদি কোনো কারণে বাচ্চা খুব অসুস্থ থাকে, অথবা মা যদি প্রথম থেকেই বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে নারাজ হন তবে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। অবশ্য অনেক সময় শুধুমাত্র বেশী পরিমাণে দুধ উৎপন্ন হয় বলেও এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ যন্ত্রণা-দায়ক অবস্থা অবশ্য কয়েকদিন মাত্র থাকে। বুকের দুধ যখন বেশী থাকে তখন আঙুল দিয়ে টিপে অথবা ব্রেস্ট পাম্পের সাহায্যে দুধ বের করে দিতে হবে। স্তনের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা দুগ্ধগ্রন্থি থেকেই বুকে দুধ হয়। স্তননালী বেয়ে সেই দুধ স্তনের সম্মুখে কালো অংশের নীচে ছোট ছোট আধারে (সাইনাসগুলি) সঞ্চিত হয়। যদি এই সাইনাসগুলি দুধে অত্যধিক পূর্ণ থাকে তবে স্তনের বোঁটা শক্ত হয়ে ফুলে স্তনের সঙ্গে সমতল হয়ে লেপটে যায়। তখন শিশু ওই বোঁটা মুখে পুরতে পারে না। এরূপ অবস্থায় প্রথমেই আঙুল দিয়ে টিপে কিছু দুধ বের করে দিলেই শক্ত সাইনাস নরম হবে। স্তনের বোঁটাও শিশু মুখে পুরে দুধ চুষতে পারবে।

যদি সমগ্র স্তনই অত্যধিক দুধে শক্ত হয়ে যন্ত্রণা হতে থাকে এবং সর্বদাই পাম্পের সাহায্যে দুধ বার করতে হয় তবে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং পাম্প ব্যবহারে না গিয়ে গরম জলে কাপড় ভিজিয়ে দুধে যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্তনকে সেঁক দিতে হবে, সেঁক দেবার পর স্তনের গোড়া থেকে আরম্ভ করে বোঁটার দিকে তেল বা ক্রীম দিয়ে মালিশ করতে হবে। মালিশ করবার সময় স্তনের নরম চামড়ার যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে, বোঁটার চারিদিকের কালো অংশে তেল বা ক্রীম যেন না লাগে, লাগলে তা পিছল হয়ে যাবে, পিছল হলে শিশুর দুধ চোষার অসুবিধা হবে। এভাবে মালিশের পর বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে সাইনাস থেকে দুধকে বোঁটা সংলগ্ন কালো অংশে নিয়ে আসতে হবে।

কোন কোন মা 'ব্রেস্ট পাম্প' ব্যবহারে পক্ষপাতী। অধিকাংশ ওষুধের দোকানে এই পাম্প পাওয়া যায়। পাম্পের কাচের মুখ স্তনের সঙ্গে লাগিয়ে রবারের বাল্বে চাপ দিতে হবে, চাপসৃষ্ট

সংকোচনে বুকের দুধ টেনে আনবে। সাধারণত স্তন দুধের আধিক্যে শক্ত হলে উদ্বেগের কারণ নেই। শুরু থেকে যত্ন করলে কিছুদিনের মধ্যেই তা স্বাভাবিক হয়। কখনও কখনও দেখা যায় সমস্ত স্তনটা শক্ত, ভারী আর বেদনাদায়ক হয়ে গেছে। চামড়ার উপর দিয়ে নীল রঙের মোটা মোটা শিরা দেখা যাচ্ছে। আর সেইসঙ্গে মার জ্বর আসছে।—এই অবস্থা কিন্তু দুধের সংক্রমণের প্রথম লক্ষণও হতে পারে। এখানে চিকিৎসকের পরামর্শ খুবই প্রয়োজন। অন্যথায় স্তনের ভিতরে ফোঁড়া হয়ে যেতে পারে, যেটা আপনাদের কাছে ধরা পড়বে অনেক দেরিতে এবং অপারেশন হয়ে উঠবে অবশ্যম্ভাবী।

শিশুকে কখন খাওয়ানো শুরু করতে হবে : আগেকার দিনে বিশ্বাস ছিল শিশু ভূমিষ্ঠ হবার দিন কেবল জীবাণুমুক্ত জল বা গ্লুকোজের জল খাওয়াতে হয়। কিন্তু শিশু-বিশেষজ্ঞগণ এখন বিশ্বাস করেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব এমন কি ডেলিভারি কক্ষেই শিশুকে বুকের দুধ খেতে দেওয়া উচিত। শিশু যখনই ক্ষুধার্ত হবে তখন থেকেই তাকে খাওয়াতে হবে। ডেলিভারির পরই বুকে দুধ না এলেও শিশুকে স্তন চুষতে দিলে ভবিষ্যতে বুকের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে এবং মা ও শিশুর মধুর সম্পর্কের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। অনেক শিশুকে দেখা যায় জন্মের পরই ক্ষুধার্ত এবং বুকের দুধ খেতে চায়। কেউ কেউ আবার বেশ কয়েক ঘণ্টা যাবৎ খেতে চায় না। নবজাত শিশুদের প্রথম কয়েকদিন খাদ্যের চাহিদা সাধারণভাবে কম থাকে এবং তখন বুকের দুধে যে 'কোলোস্ট্রাম' জন্মায় তাতেই তারা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত থাকে। এই সময়ে শিশুকে ক্ষুধার্ত মনে হলেই প্রচুর প্রোটিন ও ক্যালোরিযুক্ত বুকের ওই দুধ দেওয়া উচিত। এতে দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস গড়ে উঠবে। পরে বুকের দুধ যখন বাড়তে থাকবে শিশুও তার তৃপ্তিমত একবারেই বেশ কিছুটা দুধ খেয়ে নিতে সমর্থ হবে। তখন দেখা যাবে যে নিজে থেকেই শিশু ২ ঘণ্টা হতে ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত শান্ত থাকবে। এই ভাবেই শিশু নিজেই তার খাবার অভ্যাস তৈরী করে নেবে। মায়ের বুকে উপযুক্ত পরিমাণ দুধ আসতে ৫ থেকে ৮ দিন লাগে। এই সময়ের মধ্যে শিশুও বুকের দুধ খেতে শিখে নেবে। সুতরাং শিশুর ভূমিষ্ঠ হবার পর প্রথম ক'দিন বুকের দুধের জন্য

উদ্বিগ্ন না হয়ে অল্প সময় পর পর স্তন চুষতে দিতে হবে। তাকে কখনই বুকের দুধের বিকল্প হিসাবে কৃত্রিম খাদ্য ওই সময়ে দেওয়া উচিত নয়। তাতে বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে ব্যর্থতা আসবেই। শিশুকে মায়ের কাছে রাখতে হবে, পৃথক করে নয়। শিশুর কান্না মায়ের বুকে দুধের প্রবাহ নিয়ে আসে—যেমন কান্না চোখে জল আনে।

অনেক মায়ের বিশ্বাস যে বুকের দুধ খেলে কোন কোন শিশুর পায়খানা পাতলা এবং বার বার হয়। এটাই স্বাভাবিক, এতে আশঙ্কা করার কোন কারণ নেই। পাতলা পায়খানার জন্য কোন কোন মায়ের আরও বিশ্বাস যে তাঁদের দুধ শিশুর ধাতে সইছে না। এটাই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। বুকের দুধ খেয়ে-থাকা শিশুদের বার বার পায়খানা হওয়া এবং দুধ খাবার পরই পায়খানা করাটা খুবই স্বাভাবিক। এর জন্যে বুকের দুধে কিছু দোষ আছে তা মনে করা উচিত নয়। বুকের দুধ খেলেই শিশুর পাকস্থলীতে পাক দেয়, যেমন সকালের চায়ে (বেড টি) বয়স্কদের পেটে দেয়। অনেক মায়ের অত্যধিক অ্যাসিড বা অম্বল আছে। তাঁরা মনে করতে পারেন যে তাঁদের বুকের দুধেও ওই অম্বল মিশে থাকে তাই তা শিশুর পক্ষে অনুপযোগী। মায়ের অ্যাসিডে বুকের দুধের বিভিন্ন উপাদান প্রভাবিত হয় না এবং এক মায়ের থেকে অপর মায়ের দুধ আলাদাও নয়, যে যাই বলুক, **মায়ের অ্যাসিড মায়ের নিজেরই সমস্যা, ওই অ্যাসিডে বুকের দুধে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া হয় না বা বাচ্চারও কোন ক্ষতি করে না।**

বুকের দুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি : ইতিপূর্বে বুকের উৎপন্ন দুধ কি ভাবে সাইনাসের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে স্তনের বোঁটার সংলগ্ন কালো বেষ্টনীতে সঞ্চিত হয় তা বলা হয়েছে। স্তনের বোঁটাতে এই সাইনাসগুলির মুখ রয়েছে। শিশু অবশ্যই বোঁটার কালো অংশ পুরোটা না হলেও অনেকটা মুখে পুরে চুষবে যাতে তার মাড়ি দিয়ে চাপ দিয়ে সাইনাসগুলি থেকে দুধ নিংড়ে নিতে পারে। বোঁটার আকারের ছোট বড় তারতম্য বিশেষ কিছু আসে না। মনে রাখা দরকার শিশু দুধের সন্ধান বোঁটার সাহায্যেই পায়। শিশু যদি জেগে থাকে এবং ক্ষুধার্ত হয়, তাহলে স্তনের বোঁটা শিশুর মুখে ছোঁয়ালেই

সে হাঁ করে বোঁটার দিকে ফিরবে। এই ভাবে শিশু যাতে বোঁটা খুঁজে যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। শিশুর গাল আঙুল দিয়ে চেপে দুধের বোঁটা জোর করে শিশুর মুখে ঢুকিয়ে দিলে শিশু ক্ষেপে যায়।

প্রত্যেকবার দুধ খাওয়াবার আগে এবং পরে স্তনের বোঁটা ও তার চারপাশ পাঁচ মিনিট-ব্যাপী জলে ফোটান তুলোর দলা দিয়ে ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। বোঁটা পরিষ্কার এবং শুকনো



রাখলে মা এবং শিশুর উভয়েরই ভাল। পরিষ্কার এবং শুকনো বোঁটায় যন্ত্রণাদায়ক চিড় ধরে না। যদি বোঁটাতে এরূপ যন্ত্রণাদায়ক চিড় ধরে এবং সেখান থেকে রস গড়ায় তবে ১—২ দিনের জন্য শিশুকে ঐ স্তন চুষতে না দিয়ে, সমস্ত দুধটা একটা পরিষ্কার, জলে

ফুটিয়ে বিশুদ্ধ করা বোতলে নিঙড়ে বের করে শিশুকে দেওয়া যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে, যেন ঐ স্তনটিতে দুধ মোটেই জমতে না পারে। এবং সেইসঙ্গে হাল্কা, ঢিলেঢালা পরিচ্ছদ পরতে হবে। যাতে চিড়টা শুকোবার অবসর পায়। 2% জেনসিয়ান ভায়োলেট অনেক সময় ভালো কাজ দেয়। এই ঔষধ বাচ্চার মুখ দিয়ে পেটে গেলেও এতে কোনো ক্ষতি হয় না। তারপরে ঐ চিড় সম্পূর্ণ সেরে গেলে ঐ স্তন চুষতে দেওয়া ঠিক হবে। অথবা নিপ্‌ল্‌ শীল্ডের সাহায্যে ঐ স্তন চিড় থাকা অবস্থাতেও চুষতে দেওয়া যেতে পারে।

দুধ খাওয়াবার আগে মাকে বেশ আরাম করে সুস্থভাবে বসে, বসতে না পারলে শুয়ে নিতে হবে। মা যদি উত্তেজিত বা অস্থির অবস্থায় থাকেন তবে শিশুও অস্থির হয়ে উঠবে ; দুধ খেয়েও শান্ত হবে না, কারণ অস্থির অবস্থায় মায়ের দুধ উপযুক্ত পরিমাণে প্রবাহিত হয় না। ফলে মা ও শিশু উভয়েরই কষ্ট হবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর প্রথম কয়দিন মায়ের বসতে অসুবিধা হতে পারে, তখন বসার দরকারও হয় না। তখন শুয়ে দুধ দেওয়ার কাজ চলতে পারে। তবে দুধ দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিশু নিঃশ্বাস নিতে পারে। শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি না হয় তার প্রতি সজাগ এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

শিশুকে প্রথমে একটি স্তনের দুধ খাওয়াতে হয়, সেই স্তনের দুধ নিঃশেষ হলেই তবে অপরটির দুধ খাওয়াতে হবে। এমনি করে পালটা-পালটি করে দুটি স্তনের দুধই নিঃশেষ করে শিশুকে খাওয়ানো হলে মায়ের বুকে তার সন্তানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দুধ আসবে। কোনও কোনও বাচ্চা তার জন্মের প্রথম দিন থেকেই চমৎকারভাবে বুকের দুধ খায়। তারা বেশ জোরে জোরে দুধ টেনে ৬-৮ মিনিটের মধ্যেই সবটা খেয়ে নেয়। আবার কোন কোন শিশু প্রথম দুই সপ্তাহ সামান্য দুধ খায় এবং খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। এরকম করতে দেওয়া ঠিক নয়, কারণ একটু পরেই তাহলে জেগে যাবে এবং ক্ষিধেয় কান্না জুড়বে। তাই যখন সে প্রথম সামান্য দুধ খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে তখনই তার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তাকে উপুড় করে কাঁধে নিয়ে ঢেকুর তুলিয়ে পুনরায় বুকের দুধ দিতে হবে। ছোট বা দুর্বল শিশুকে খাওয়ানো বিশেষভাবে কষ্ট-

সাধ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। যে শিশুর ওজন ২ কেজি বা তার কম তাদের খাওয়াতে ধৈর্য ও সময় লাগে।

শিশুকে ঢেকুর তোলানো : প্রত্যেকবার দুধ খাওয়াবার পর শিশুর পেটের হাওয়া অবশ্যই বার করে দিতে হবে। শিশু দুধ খাবার সময় বেশ কিছুটা হাওয়া গ্রহণ করে ফেলে। শুয়ে থাকা শিশু সেই হাওয়া বের করতে পারে না বলে তার পেট হাওয়ায় ফোলা থাকে। তাতে তার খুব অস্বস্তি হয়, পেটে যন্ত্রণাও হতে পারে। আর যদিবা শিশু দুধ খেয়ে ঢেকুর তোলে তবে তার সঙ্গে কিছু দুধ বেরিয়ে আসে। বরঞ্চ শিশুর দুধ খাওয়ার পর কোলে বসিয়ে তার পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দেওয়া চমৎকার প্রথা, অথবা দুধ খাওয়ার পর শিশুকে আস্তে আস্তে কাঁধে তুলে অন্তত পাঁচ মিনিট রেখে ধীরে সুস্থে শুইয়ে দিতে হবে। এর জন্যে মায়ের ধৈর্য বিশেষ প্রয়োজন, এতে শিশুর খুব আরাম হয় এবং তার দুধ তোলার সম্ভাবনাও কম থাকে। দুধ খাওয়াবার পর শোয়াবার সময় শিশুকে ডান কাত করে শোয়ানো নিরাপদ। কারণ ডান কাতে শোয়ালে তার পেটের দুধ হজম হতে সাহায্য করে। অন্যদিকে শিশু ঢেকুর তুলে দুধ তুললেও সেই দুধ চাদরে পড়বে, তার নাক মুখকে অবরুদ্ধ করবে না, শ্বাস-প্রশ্বাসও কোন বাধা পাবে না।

শিশুকে কতবার খাওয়াতে হবে : কায়িক পরিশ্রমের গ্রামীণ মহিলাদের অনেকেই নবজাত শিশুকে কাপড়ের ঝোলায় বেঁধে বুকে করে নিয়ে কাজে যান। বাচ্চা ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজেই তার ইচ্ছে মতো যতক্ষণ খুশী বুকের দুধ পান করে। এই বাচ্চারা বেশ সতেজ হয় এবং এরা পেটের রোগ-ব্যথায় খুব কমই কষ্ট পায়, বমিও করে কম। এভাবে বাচ্চা বহন করা আমাদের সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এটাও ঠিক যে, মা ও শিশু—উভয়েরই একটা নির্দিষ্ট রুটিনে দুধ খাওয়ানো এবং খাওয়া ভাল। অধিকাংশ শিশু তার জীবনের প্রথম ২/৩ দিন বুকের অল্প দুধ খেয়েই ৩-৪ ঘণ্টা তৃপ্ত থাকে। ৪-৫ দিনে মায়ের বুকেও ধীরে ধীরে দুধ আসতে থাকে, বাচ্চারও ক্রমশ ক্ষিধে বাড়ে ও বারবার খাবার চায়। যদি শিশুর আগেই ক্ষিধে পায় তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করার যুক্তি বা প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পেট ভরে দুধ খাওয়াতে হবে এবং পরবর্তী খাবারের সময় নির্দিষ্ট সময় থেকে ২-৩ ঘণ্টা

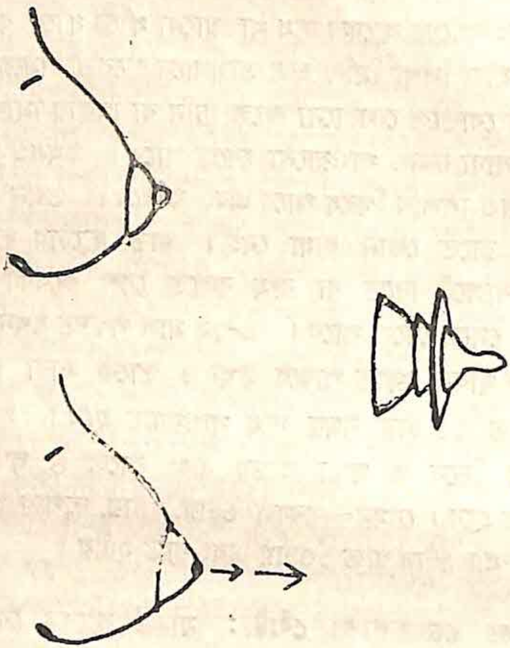
পিছিয়ে দিতে হবে। যেসব শিশু দুই কেজি বা তার কম ওজন তারা একবারে কম খায়। সুতরাং তাদের দুই ঘণ্টা অন্তর বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, অপেক্ষাকৃত বেশি ওজনের শিশুরা একবারেই পেট ভরে বেশ কিছুটা দুধ খেতে সমর্থ হয়। তাদের ৩-৪ ঘণ্টা অন্তর খাওয়ালে চলে। কিন্তু যদি দেখা যায় শিশু ২-৩ ঘণ্টার আগেই ক্ষিধেয় কাঁদে তবে তাকে ফোটান জল বোতলে করে খেতে দেওয়া উচিত, এতে সে কিছুক্ষণ শান্ত ও তৃপ্ত থাকবে এবং দিব্যি নির্দিষ্ট ৩-৪ ঘণ্টার পর বেশ ভালভাবে বুকের দুধে ক্ষিধে মিটিয়ে খাবে। এইরূপ একটি রুটিনে শিশুকে অভ্যস্ত করতে কিছুদিন সময় লাগবে। অনেক মা বাচ্চা কাঁদলেই এক-আধ ঘণ্টার মধ্যেই বুকের দুধ খেতে দেন, তাতে বাচ্চার পেট খালি হয় না, ফলে সামান্য কিছু দুধ চুষে খাবার পরেই আর খেতে চায় না, অসময়ে আবার তার ক্ষিধে পায়। অন্য দিকে আবার অত্যধিক সময়ানুবর্তী হওয়াও উচিত নয়। অনেক সময় সময়ে-খাওয়া শিশুরাও পায়খানা করলে বা আগের বারের খাওয়া দুধ বমি করে ফেললে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ক্ষুধার্ত হয়। তখন সময়ের আগেই তাকে বুকের দুধ খাওয়ানোতে ভয় পাবার কিছু নেই। এক আধ দিনের এমনি ঘটনায় শিশুর খাবার সময়ের অভ্যাস নষ্ট হয় না। যতক্ষণ শিশুর ক্ষিধে পায় এবং ভালভাবে তৃপ্তিমত দুধ খায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঠিক ৩-৪ ঘণ্টা পর পর খেয়েই শান্ত থাকবে। শিশু যদি খাবার আগ্রহ প্রকাশ না করে গভীর ঘুমে থাকে তবে তাকে জাগানো উচিত নয়। তার ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত দুধ খাওয়ানোর জন্য অপেক্ষা করাই ভাল। ঘুম থেকে উঠে সে অনেকটা বেশি দুধ খেয়ে নেবে। ঘুম থেকে জোর করে উঠিয়ে খাওয়ালে সে অল্প একটু দুধ খেয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়বে।

শিশুর রাতের খাওয়া : জন্মের পর ৬-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত শিশুকে বুকের দুধ রাত ১০ টায় খাইয়ে পুনরায় রাত দুটোয় খাওয়ানো দরকার হয়। এই বয়সের কচি শিশুরা এতো অল্প খায় যে একবারে খেয়েই সারা রাত কাটাতে পারে না। এই সময়ে রাতে শিশু যখন ঘুম থেকে উঠবে তখন তাকে বুকের দুধ দিতে হবে। রাতে খাওয়ালেই বদ হজম ও বদ অভ্যাস হবে এই ভেবে উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। শিশুর হজম শক্তি দিনে ও রাতে একই রূপ থাকে।

শিশুকে ক্রমশ বোঝাতে হবে রাতটা ঘুমের সময়। সুতরাং প্রথম দু'মাসের পর শিশুর ওজন যদি সন্তোষজনকভাবে বাড়ে তবে তাকে রাত ২টার সময়ের বুকের দুধ খাওয়ানো ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিতে হবে। যদি শিশু মিষ্টি জল ভালবাসে তবে ঐ সময়ে বুকের দুধের পরিবর্তে বোতলে ফোটানো জলে চিনি বা মিছরি মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। সাদা জলও খাওয়ানো যেতে পারে। কখনও কখনও হয়তো জল খেয়েও শিশুর ক্ষিধে পাবে এবং কাঁদবে। তখন তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে কোন বাধা নেই। রাত দুটোর দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস পালটে দিতে বা বন্ধ করতে বেশ কয়েকদিন এমন কি সপ্তাহও লেগে যেতে পারে। ৯-১২ মাস পর্যন্ত যখন শিশু সন্ধ্যার সময় শক্ত খাবার খেতে পারবে তখনও তাকে সারা রাত কাটাবার জন্য রাত ১০ টার সময় দুধ খাওয়াতে হবে। সাধারণত ছোট শিশুদের দিনে ৩ ঘণ্টা অন্তর এবং রাতে ৪ ঘণ্টা অন্তর দুধ খাওয়াতে হবে। যেমন—সকাল ৬টায়, ৯টায়, দুপুর ১২টায়, বিকেল ৩টায়, সন্ধ্যা ৬টায় রাত ১০টায় এবং রাত ২টায়।

বুকের ডেবে-থাকা বোঁটা : যদিও বুকের বোঁটার আকার বিশেষের গুরুত্ব কম কারণ শিশু বুকের প্রায় পুরো কালো অংশই মুখে পুরে মাড়ি দিয়ে দুধ নিঙড়ে নেয়, তবুও বুকের বোঁটা বেশি ডাবা অবস্থায় থাকলে শিশুর তা মুখে ধরতে অসুবিধা হয়। সেইজন্য প্রতিবার দুধ খাওয়ানোর আগে মালিশ করে করে বোঁটাকে বের করতে মায়ের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত। এভাবে কয়েকদিন চেষ্টা করলেই ওই সমস্যা থাকবে না। যদি দেখা যায় চেষ্টা করেও বুকের বোঁটা কিছুতেই বের করা যাচ্ছে না বা দুধের আধিক্যবশত বুক শক্ত হয়ে থাকার ফলে বোঁটাকে মালিশ করেও ওঠান সম্ভব হচ্ছে না তবে একমাত্র সে ক্ষেত্রে নিপ্‌ল শীল্ড ব্যবহার করা সহায়ক হবে। একটা প্লাস্টিকের আবরণের সঙ্গে রবারের বোঁটা লাগানো থাকে। ওই প্লাস্টিকের আবরণটিকে বুকের কালো অংশে শক্ত করে লাগিয়ে নিতে হয়। শিশু যেই রবারের বোঁটাটি টানে তখন প্লাস্টিক আবরণে শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে দুধ বের করে আনতে সাহায্য করে, সঙ্গে সঙ্গে বুকের বোঁটাও উন্নত হয়ে ওঠে। কিছুদিন এই রকম করার পর বুকের বোঁটা উন্নত হবে এবং শিশু সরাসরি তা টানতে পারবে।

বুকের দুধ খাওয়াবার আগে ও পরে প্লাস্টিকের নিপ্‌ল শীল্ডকে



ফুটন্ত জলে ধুয়ে নিতে হবে। বুকের বোঁটা ফেটে গেলে বা চিড় ধরলেও নিপ্‌ল শীল্ড ব্যবহার উপযোগী।

বোতলে কৃত্রিমভাবে দুধ খাওয়ানো: মা বাড়ির বাইরের কর্মস্থলে যদি বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য থাকেন বা মায়ের বুকে যদি সর্বপ্রকার চেষ্টাতেও উপযুক্ত দুধ না হয় অথবা শিশু কিছুটা বড় হবার জন্য বুকের দুধের অতিরিক্ত যদি তার খাদ্য চাহিদা থাকে তবে বোতলে করে তাকে দুধ খাওয়াতে হবে। মায়ের বুকে উপযুক্ত পরিমাণে দুধ পাওয়া না গেলেই হঠাৎ করেই বোতলের দুধ ধরান উচিত নয়। আগে বুকের বোঁটা শিশুর মুখে বারে বারে দিতে হবে কারণ শিশুর চোষাই মায়ের বুকের দুধ আনার উত্তেজক। এক সপ্তাহকাল এভাবে চেষ্টা করতে করতে যখন দেখা যাবে যে শিশু ৩ ঘণ্টার আগেই বার বার খেতে চায় ও কাঁদে এবং শিশুর ওজন বাড়ছে না, তখনই কেবল বোতলের দুধ দিতে হবে এবং তার খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

এটা দুভাবে করা যায়। যদি মা তখনও বুকের দুধের ওপর নির্ভর করে শিশুকে রাখতে চান, (মায়ের অসুখ হলে বা শরীরের ধকল গেলে সাময়িকভাবে তার বুকে দুধের ঘাটতি হতে পারে) তবে প্রথমে দু দিকের দুটি বুকের দুধই নিঃশেষ করে শিশুকে পান করিয়ে বোতলের দুধ মুখে দিতে হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় বাস্তবিকই বুকের দুধ ক্রমশ কমে যাচ্ছে তাহলে আর ওসব ঝঞ্ঝাট না করে বরং দিনে দু' একবার বুকের দুধ খাইয়ে বোতলের দুধই খাওয়ানো উচিত। বোতলে খাওয়ানোর আর একটি কারণও আছে এবং তা হল বাচ্চাকে বুকের দুধ ছাড়াও বাইরের দুধের সঙ্গে অভ্যস্ত করা। ৪-৫ মাসের সময়, যখন পর্যন্ত শিশুর খাওয়া নিয়ে পছন্দ অপছন্দ গড়ে উঠবে না, তখনই তাকে বাইরের দুধ খেতে শেখানো দরকার। ৫ মাস বয়সে শিশু বাটিতে দুধ খেতে পারবে, অবশ্য প্রথমে খুব বেশি বা ভালভাবে খেতে পারবে না। তবুও শিশুকে কিছুকাল বাটিতে করে দুধ খাইয়ে যেতে হবে। যদি শিশু বাটির দুধ ঠিকমতো খেতে না পারায় ক্ষুধার্ত থেকে যায় তবে তখনই তাকে বোতলের দুধ দিতে হবে। বোতলের দুধ খাওয়ানোর জন্য মাকে একটু কষ্ট করতে হয়। বোতলকে জলে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। অনেক মা বাচ্চাকে এক বছর এমনকি দু' বছর পর্যন্ত বুকের দুধ দিয়ে থাকেন। যদি বাচ্চা অন্যান্য প্রয়োজনীয় শক্ত খাদ্য তার সঙ্গে খায় তবে এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু এটাও অনেক সময়ই দেখা যায় যে শিশু শুধুমাত্র আরাম পাওয়ার জন্য মায়ের শুকনো বা প্রায় শুকনো বুকে ক্রমাগত চুষে যাচ্ছে, আর কোনও উপায়ে সে অন্য কোন খাদ্য খেতে চাইছে না, সেক্ষেত্রে কেবল শিশুর আরামের জন্য তাকে এভাবে বুক চুষতে দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এতে দু-একদিন দারুণ কান্নাকাটি—চেঁচামেচি করার পর ক্ষিধের তাড়নায় অবশেষে সে বাইরের খাবার খেতে বাধ্য হবে।

শিশুকে কৃত্রিমভাবে দুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি

আমাদের দেশে ঝিনুকে করে শিশুকে দুধ খাওয়াবার ব্যাপক প্রচলন আছে। ঝিনুকে দুধ খাইয়ে সন্তোষজনক ফল যে পাওয়া যায় এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এর কিছু অসুবিধার দিকও আছে। প্রথমত, ঝিনুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য দক্ষতার

প্রয়োজন, অন্যথায় বেশি দুধ মুখে গিয়ে শিশুর শ্বাসরুদ্ধ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এতে শিশুকে তার চাহিদার চেয়ে কম বা বেশি দুধ খাওয়ানোর সম্ভাবনা থাকে। কেন না ঝিনুকে দুধ খাওয়ালে শিশু বাস্তবিকই কতটা খেতে চায়, তা সব সময় বোঝা যায় না। বোতলে দুধ খাওয়ালে শিশু তার প্রয়োজনমত দুধ চুষে খাবে, তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর খাবে না। সবচেয়ে বেশি অসুবিধার দিক হচ্ছে ঝিনুকে দুধ খাওয়ালে শিশুর চুষে খাওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা অতৃপ্ত থাকে। বুকের দুধ বা বোতলের দুধ চুষে খাওয়ার মধ্য দিয়ে শিশু অপরিমিত তৃপ্তি ও আনন্দ পায়। তাতে তার নিরাপত্তাবোধ ও স্বস্তির অনুভূতি বজায় থাকে, যা বুকের দুধ ও বোতলের দুধ খাবার সময় শিশুর চেহারায় ফুটে ওঠে। অন্যদিকে ঝিনুকে দুধ খাওয়ানো একটা কসরতের কাজ মনে হয়। শিশুকে জোর করে ধরে মুখে ঝিনুক পুরে দিয়ে দুধটা মুখের মধ্যে ঢেলে দেওয়ায় শিশু তা আরাম করে না খেয়ে গব গব করে গিলে ফেলতে বাধ্য হয়, তাতে তার মনে আঘাত লাগাই স্বাভাবিক, কেন না এতে কোন আনন্দ না পেয়ে, এক ধরনের বিরোধিতার আভাস পায়, ফলে দুধ খাওয়াটাই তার কাছে ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে।

অবিশ্যি যেক্ষেত্রে দুধের বোতল ভালভাবে ফুটন্ত জলে ধুয়ে পরিষ্কার করা সম্ভব নয় (এমন পরিবেশ আমাদের দেশে বহু আছে) সেখানে স্রেফ দুধের বোতল ব্যবহারের চেয়ে বাটি-ঝিনুকের ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়। বাটি-ঝিনুক পরিষ্কার জলে সাবান দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে পরিচ্ছন্ন স্থানে আলাদা করে রাখলেই চলে।

বিভিন্ন রকমের দুধ : খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া গেলে (ছাগলের দুধও বটে) এবং তা খাওয়াতে চাইলে কোন ক্ষতি হয় না। প্রথম কয়েক মাস খাঁটি গরুর দুধের সঙ্গে চিনি বা গ্লুকোজ দিয়ে সম-পরিমাণ জল মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। গরুর দুধে মায়ের বুকের দুধের চেয়ে প্রোটিন বেশি ও শর্করা কম থাকে। যদিও নবজাত শিশুকে খাঁটি গরুর দুধ হজম করতে দেখা গেছে, তথাপি ওই দুধের প্রোটিনকে শিশুর উপযোগী করে তোলার জন্য দুধে জল মিশিয়ে খাওয়ান প্রয়োজন।

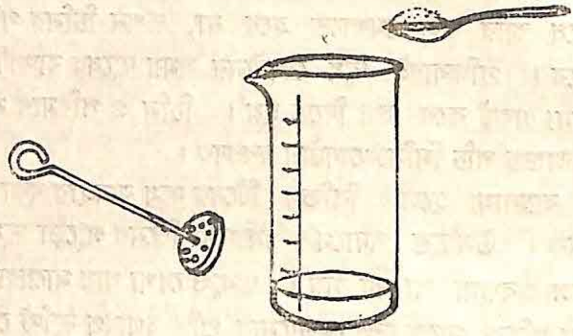
প্রথম মাসে গরুর দুধের সমপরিমাণ জল মিশিয়ে প্রতি ৫ আউন্স ওই জল মেশান দুধের সঙ্গে চায়ের চামচের এক চামচ চিনি গুলে

খাওয়াতে হবে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে দুই-তৃতীয়াংশ দুধের সঙ্গে এক তৃতীয়াংশ জল মিশিয়ে দিতে হবে। ৫ আউন্স ঐ দুধে চায়ের চামচের এক চামচের হিসাবে চিনি মেশাতে হবে। ৫-৬ মাসের সময়ে গরুর দুধে আর জল মেশাতে হবে না, তখন চিনির পরিমাণও কমাতে হবে। প্রতিবারই দুধ ফোটানর সময় দুধের বাষ্পীভবনের জন্য সামান্য একটু করে জল দিতে হয়। চিনি ও পরিমাণ মত জল দিয়ে দুধ অন্তত পাঁচ মিনিট ফোটান দরকার।

একটু ব্যয়সাধ্য হলেও বিভিন্ন টিনের দুধ ব্যবহার করা অনেক সুবিধাজনক। উপযুক্ত পদার্থের মিশ্রণে টিনের গুঁড়ো দুধ তৈরী এবং শীতল অবস্থায় পাওয়া যায়। তবুও দেখা যায় মায়েরা টিনের দুধের সঙ্গে সঠিক মাপে জল মেশানোর প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেন না, জলও মেশান না; যদিও এই মাপ ঠিক রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ অতি সহজ কাজ। বহু মায়েদের বলতে শোনা যায় "দুধ বড় ঘন হয়ে গেল" বা "বাচচার পায়খানা খুবই শক্ত হয়ে যাচ্ছে" এবং এই মানসিকতায় তাঁরা গুঁড়ো দুধ কম দিয়ে বোতলে জলের অংশ ঠিক রেখে সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু তাতে জলের পরিমাণ ঠিক থাকলেও প্রকৃত দুধের পরিমাণ ঠিক থাকে না, তার মাপে ঘাটতি হয়। মেশান গুঁড়ো দুধটাই প্রকৃতপক্ষে দুধের কাজ করে। জলটা নয়। মাপ মতো তৈরী করা টিনের দুধ মায়ের বুকের দুধের সমান—সেই দুধকে দেখতে ঘন কি পাতলা সেটা কোনও ব্যাপার নয়।

গুঁড়ো দুধ ভালভাবে মেশানোর জন্য একটা মিল্ক-মিক্সারের প্রয়োজন হয়। এতে আউন্সের দাগ কাটা থাকে, আর থাকে দুধ মেশানোর জন্যে একটা স্টিল বা অ্যালুমিনিয়ামের কাঁটা। যদি মিল্ক মিক্সার না থাকে, তবে ফোটান জল দুধের বোতলে মেপে নেওয়া যায়, দুধের বোতলগুলোতেও আউন্সের মাপ থাকে। সঠিক পরিমাণ গুঁড়ো দুধ বাটিতে বা মিল্ক মিক্সারে রেখে আউন্সের মাপ মত ফোটান জল দিয়ে একটা পরিষ্কার চামচ অথবা মিক্সারার দিয়ে ভালভাবে নেড়ে জলের সঙ্গে গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে ফেলতে হবে। দুধ মেশানোর নিয়ম এত সহজ যে মায়েদের এ নিয়ে ভাবনার কোন কারণ নেই। আমাদের দেশে সমস্ত রকমের বেবী মিল্ক পাউডারের লেভেল করা কৌটার মধ্যে একই মাপের পরিমাপক চামচ দেওয়া

থাকে এবং কত আউন্স জলে কত গঁুড়ো দুধ মেশাবেন তার নির্দেশিকা থাকে। প্রতি এক আউন্স জলে এক চামচ দুধ মেশাতে



হবে, তিন পরিমাপক চামচ গঁুড়ো দুধে তিন আউন্স জল দিতে হবে।

কোনও কোনও বোতলে শুধু সি, সি, এম (অথবা কিউবিক সেণ্টিমিটার) বা এম, এল, (মিলি লিটার)। চিহ্ন থাকে। এ সব ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ৩০ সি. সি বা এম. এল. মানে এক আউন্স। আউন্স চিহ্নিত বোতল কিনলেই মাপ ধরা সহজ হবে।

দুধের বোতলের প্রস্তুতি : বড় মুখওয়ালা সোজা বোতলের মুখের দিকে বোঁটা রেখে নির্দিষ্ট ঢাকনা দিয়ে বোতলের প্যাঁচে ভালভাবে লাগাতে হবে। নৌকার আকারের আগেকার দিনের দুধের বোতলের দু'দিকের মুখ সরু থাকায় পরিষ্কার করা কষ্ট এবং এতে মাপও থাকে না। নতুন ধরনের সোজা বড় মুখের বোতলের আগার প্যাঁচের ঢাকনার মধ্য দিয়ে হাওয়া ঢুকে শিশুকে দুধ টানতে সাহায্য করে। যদি দেখা যায় দুধ খাবার সময় বোতলের দুধে বুদবুদ উঠছে না তবে প্যাঁচের ঢাকনাটাকে একটু ঢিলে করে আটকাতে হবে।

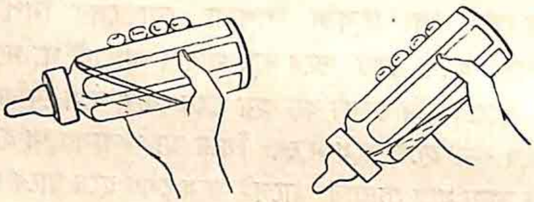
৩।৪টি বোতল কিনে রাখলে তা গরম জলে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে ধুয়ে রাখা যায় এবং প্রতিবার দুধ খাওয়াবার সময় পরিষ্কার করার যে ঝঞ্ঝাট তাও পোয়াতে হয় না। দুধের বোতলগুলিকে একসঙ্গে জলে ফোটানোর জন্য বেশ বড় পাত্র রাখা উচিত। যে কোন

ঢাকনাযুক্ত রান্নার বাসনে বোতল ফোটানো চলে। বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে সাবান দিয়ে বোতলগুলো বোতল-ব্রাশ দিয়ে ধুয়ে বোতল, নিপ্‌ল ও প্যাঁচের ঢাকনা একসঙ্গে ফোটানোর বাসনে রেখে ঠাণ্ডা জলে আগে রাখতে হবে। তারপর বেশ করে অন্তত ৫ মিনিট জলে ফোটাতে হবে। ফোটান গরম জল ফেলে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। পরের বার দুধ খাওয়াবার সময় বোতল, ঢাকনা ও নিপ্‌লের বাইরের দিকটা ধরে ব্যবহার করতে হবে যাতে ওগুলোর ভিতরের দিকে আঙুল না লাগে।

বোতলের নিপ্‌লের ফুটো : নতুন অবস্থার অধিকাংশ বোতলের নিপ্‌ল একটু করে ফুটো থাকে। ব্যবহারের আগে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে ওই ফুটোর সাইজ ঠিক আছে কি না। শিশু বিশেষ করে ছোট এবং দুর্বল শিশুরা, বোতলের নিপ্‌লের মুখ একেবারে সরু হলে পেট ভরে দুধ খাবার আগেই ঘুমিয়ে পড়বে। অপরদিকে ফুটো যদি বেশী বড় হয় তবে বেশি দুধ বেরিয়ে আসবে, তাতে শিশুর কষ্ট হবে; দুধ মুখে গিয়ে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসবে এবং যথেষ্ট সময় ধরে চোষার আগেই দুধ শেষ হয়ে যাবে। নিপ্‌ল চোষা শিশুদের প্রবৃত্তিগত চাহিদা, তা পূরণ না হলে সেই সব শিশু ৪-৫ মাস বয়স থেকে আঙুল চুষতে সুরু করবে। সেইজন্য বোতলের নিপ্‌লের ফুটোর সাইজ উপযুক্ত মাপের রাখতে হয়। উপযুক্ত মাপের ফুটো পরীক্ষা করতে হলে বোতলে দুধ ভরে বোতলটি উলটিয়ে ঝাঁকালেই প্রথম ২।১ সেকেণ্ডের মধ্যেই সরু সুতোর মতো একটা ধারা নেমে আসে, তারপর ফোঁটা ফোঁটা দুধ বার হতে থাকে—এতে বুঝতে হবে নিপ্‌ল্‌-এর ফুটোর সাইজ ঠিক আছে। যদি দেখা যায় বোতল উলটিয়ে ঝাঁকালেও প্রথম থেকেই ফোঁটা ফোঁটা দুধ বের হচ্ছে তবে নিপ্‌লের ফুটো প্রয়োজনের চেয়ে ছোট বুঝতে হবে। আবার যদি ক্রমাগত ধারায় দুধ বার হতে থাকে তবে বুঝতে হবে ফুটো বেশি বড় এবং সেই নিপ্‌ল অবশ্যই ফেলে দিতে হবে। নিপ্‌লে যদি ফুটো না থাকে বা ফুটো খুবই ছোট থাকলে একটা সুঁচকে সাঁড়াশি নিয়ে ধরে আগুনের শিখায় ধরতে হবে, যখন সুঁচটা পুড়ে লাল হবে তখন তা দিয়ে নিপ্‌লে ফুটো করে নিতে হবে। ঠাণ্ডা সুঁচে নিপ্‌ল ফুটো হয় না। গরম সুঁচ দিয়ে নিপ্‌ল ফুটো করে একবার পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় তখনও ফুটো খুব ছোট, তখন

ওই আগের মতো করে নিপ্‌লের প্রথম ফুটোর পাশে আরও একটা ফুটো করতে হবে। আগের ফুটোকে বড় করার দরকার নেই কারণ তা কঠিন কাজ।

বোতলে দুধ খাওয়ানো : বোতলে দুধ খাওয়ানোর সময় বুকের দুধ খাওয়ানোর মতো শিশুকে ঠিকভাবে ধরার গুরুত্ব আছে। মা নিজে স্থিরভাবে বসে শিশুকে কোলে নিয়ে তার মাথা বাঁ বাহুর উপর সামান্য উঁচু করে রেখে দুধ খাওয়ানো সবচেয়ে ভাল। সব সময় নিপ্‌লে দুধ খাওয়ার জন্য দুধের বোতলটি একটু কাত করে ধরে রাখতে হবে। নিপ্‌লে কিছু দুধ শূন্য থাকলে শিশু দুধের সঙ্গে নিপ্‌লে ভরা হাওয়া গিলে ফেলবে।



দুধের তাপমাত্রা : শিশুকে বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা এমন কি রেফ্রিজেটরের ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ালেও ক্ষতি হয় না তা হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখা গেছে। তবে যে শিশুরা মায়ের বুকের দুধের মত মৃদু উষ্ণ দুধ খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের হঠাৎ ঠাণ্ডা দুধ দিলে তা খেতে চাইবে না। দেহের তাপমাত্রার সমান উষ্ণ দুধ শিশুকে দেওয়া উচিত, অত্যধিক গরম দুধ কখনই দেওয়া ঠিক নয়। গরম দুধ খাওয়ানোর সময় হাতের তালুতে ফেলে তাপ পরীক্ষা করে নিলে ভাল হয়। বোতলে দুধ খাওয়ানোর সময় অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি হাওয়া শিশুর পেটে ঢোকে। দুধ খাওয়াবার পর অবশ্যই তার পেটের হাওয়া পূর্বে আলোচিত পদ্ধতিতে বের করে দিতে হবে। মায়ের পক্ষে এটা একটা অবশ্য কর্তব্য।

দুধের পরিমাণ : শিশুদের প্রতিবারের দুধ খাওয়ার পরিমাণ সমান হয় না। শিশু যতটা খেতে চায় ততটা খেতে দেওয়া উচিত। আপনার আন্দাজ মতো শিশুর খাওয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করবেন না। আমাদের বড়রা যেমন পেট দেখে বোঝেন, সে রকম শিশুর

খাওয়ার পর পেটের উঁচুভাব দেখে মোটামুটি বুঝে নিতে পারা যায়। কিন্তু এভাবে বোঝা একেবারে নিখুঁত নয়। একটা কথা মনে রাখা দরকার বুকের দুধ খাওয়া শিশুরা যতটা তার প্রয়োজন ততটাই দুধ চুষে খায়। তাতে খুব একটা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয় না। সুতরাং যতটা সে খেতে চাইবে, তাকে ততটা খেতে দেওয়া উচিত। দুধ খাবার পর শিশুর পেট বেশ উঁচু দেখায়। পেটে কিছুটা হাওয়া ঢুকে যাওয়া এবং পেটের আকার ছোট হওয়ার জন্যও শিশুর পেট উঁচু দেখায়। তাই খাওয়ার পরই শিশুর পেটের উচ্চতার জন্য দুর্ভাবনার কিছু নেই। শিশুর যদি খেয়ে কোনও অসুবিধা হয় তবে সে কেঁদে তা জানিয়ে দেয়। একটি নবজাত শিশুর ২ আউন্স দুধ খাওয়া মানে বড়দের এক লিটার দুধ খাওয়ার সমান। এক লিটার দুধ খেলে আমাদের পেট কি রকম ফুলবে? কোনও কোনও বার শিশু হয়তো খুবই কম খেতে চাইবে। তাতে যদি শিশু এমনিতেই সুস্থ থাকে তবে উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। ঠিক পরের বারের খাওয়ার সময় সে আগের বারের ঘাটতি দুধ খেয়ে পূরণ করে নেবে। তবে সে যদি অভ্যাসের তুলনায় কম খেতেই থাকে তখন তাকে চিকিৎসক দেখাতে হবে। প্রথম দু' একদিন শিশু একবার আধ আউন্স কি ১ আউন্স দুধ খাবে। ক্রমে সে ২ আউন্স খেতে পারবে। যখন শিশু ২ আউন্স সহজেই খেয়ে নেবে তখন তাকে ৩ আউন্স দুধ খেতে দিতে হবে। পুরো ৩ আউন্স দুধ হয়তো সে প্রত্যেক বারই খেতে পারবে না কিন্তু তাকে তা খাবার সুযোগ দিতে হবে। মোটামুটিভাবে বলা যায় একটি শিশুর বয়স যত মাস তত মাসের সঙ্গে দুই যোগ করলে যে সংখ্যা হয় শিশু তত আউন্স দুধ প্রতিবারেই খাবে। উদাহরণ স্বরূপ ৩ মাস যদি শিশুর বয়স হয় তবে সে ৩ মাস + ২ = ৫ আউন্স দুধ প্রতিবারে খাবে। আরও একভাবে এ হিসাব করা যায়। যেমন শিশুর দেহের ওজনের কিলো প্রতি ৫ আউন্স দুধ ৪ ঘণ্টা অন্তর সে খাবে। অর্থাৎ ৫ কিলোগ্রাম ওজনের শিশু ২৫ আউন্স দুধ ২৪ ঘণ্টায় খাবে। এটা একটা সাধারণ হিসাব-নির্দেশ, একে একমাত্র নিয়ম বলে ধরে নিতে হবে না। অনেক শিশু আছে, যারা সুরু থেকেই এর বেশী খায়, আবার অনেকে এর একটু কম খায়। শিশু যদি শান্ত থাকে, তার ওজন যদি ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং দেহের স্বাভাবিক বাড় হয়, তাতেই মায়েরা নিশ্চিন্ত থাকতে

পারেন। চাহিদা মত খেয়ে যদি শিশু তৃপ্ত ও শান্ত থাকে তবে তাকে জোর করে বেশি করে খাওয়ানো একেবারেই উচিত নয়। জোর করে বেশি খাওয়ালে পরের বার সে কমই শুধু খাবে না, তাতে শিশুকে খাওয়ানো নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেবে যার ফলে শিশু আর কখনোই ক্ষুধার্তবোধ করতে এবং খেতে না চাইতে পারে, উপরন্তু প্রত্যেকবার দুধ খাওয়ানোর সময় তার সঙ্গে জোরাজুরি করতে হতে পারে। শিশুর খাবার খাওয়াকে কখনই যুদ্ধে পরিণত করা উচিত নয় বরঞ্চ একে একটা আনন্দ এবং চাওয়ার আগ্রহে সুন্দর করে তোলা উচিত। এটা করলে শিশু তার দুধ খাওয়াকে উপভোগ করবে এবং নিরাপত্তা অনুভব করবে, সে বুঝবে তার মা তারই চাহিদা পূরণ করছে। অনেক মা অভিযোগ করে থাকেন যে, তাদের বাচ্চাকে জোর করে না খাওয়ালে কিছুই খায় না। শিশুর খেতে চাইবার চাহিদা সৃষ্টি না করে তার মা-ই এ ধরনের অনাহার সমস্যা তৈরী করেছেন।

শিশুকে জল খাওয়ানো: গরমকালে শিশুদের সাধারণত দু'বার খাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে জলপানের প্রয়োজন হয়। পাঁচ মিনিট ধরে জল ফুটিয়ে তা রেখে দিনে শিশুকে ৩।৪ বার জল খেতে দেওয়া দরকার। যদি সে জল খেতে না চায় তবে বুঝতে হবে তখন তার জলের প্রয়োজন নেই। সুতরাং জোর করে জল খাওয়ানো অনুচিত। অনেক মা মনে করেন যে, শিশুকে জল খাওয়ানো অবশ্য কর্তব্য। বোঝা উচিত যে শিশুদের পুরো খাদ্যটাই তরল এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় যখন তাদের ঘাম ঝরে অতিরিক্ত জল ক্ষয় হয় না, তখন তাদের জলীয় খাদ্যের চাহিদা ঐ দুধের মাধ্যমেই মেটে। যা হোক গরমের দিনে শিশুদেরও ঘাম ঝরে, তাই তাদের জল খাওয়ার অবশ্যই দরকার। শরীরের গঠন এমনই যে তখন যদি শিশুর জল খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে তাকে জল দিলেই পিপাসা অনুযায়ী তা খেয়ে নেবে। সুতরাং জল দিতে হবে কিন্তু জোরাজুরি করে নয়। কোনও কোনও শিশু আবার সাধারণ জল খেতে চায় না, তারা মিষ্টি জল ভালবাসে। মিষ্টি জল খেতে দিলে কোনও ক্ষতি হয় না, বাচ্চার যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, তবে জলে মধু মিশিয়ে খাওয়ানো ভাল।

কমলালেবুর রস : মায়েরা শিশুদের কমলালেবু অথবা মৌসম্বি লেবুর রস খাওয়াতে খুব আগ্রহী দেখা যায়। কোন কোন মা তাদের অপরিণত শিশুদের কমলালেবু খাইয়ে দ্রুত শরীরের বৃদ্ধি হয় ভেবে কমলার রস খাওয়ান। কিন্তু কমলালেবুর রসে শরীরের বৃদ্ধি দ্রুত হয় না। কমলালেবুতে কেবল ভিটামিন 'সি' আছে, যা মালটিভিটামিন ড্রপ শিশুকে দিলেই পাওয়া যায়। সুতরাং কমলালেবু সহজলভ্য হলে নিশ্চয়ই শিশুকে তার রস খাওয়াতে হবে। কিন্তু দামে বেশি হলে তা দেবার দরকার নেই। কারণ সেক্ষেত্রে শিশুকে কমলালেবু না দিলেও তাকে বঞ্চিত করার প্রশ্ন উঠবে না। শিশু যদি কমলার রস খেতে ভালবাসে তবে তাকে কমলা দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়। শিশুকে নানা স্বাদের খাদ্যের সঙ্গে অভ্যস্ত করাবার জন্যও এসব খেতে দেওয়ার উপযোগিতা আছে। কমলার রসে শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবণতা দূর হয়। কিছু শিশুর আবার কমলালেবুর রস সহ্য হয় না, কমলার রস খেলে তাদের বমি ও পেট খারাপ হয়। সেক্ষেত্রে কমলালেবুর রস দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

এক মাস বয়স থেকে কমলালেবুর রস দেওয়া যায়। প্রথম দিন ১ চামচ লেবুর রসের সঙ্গে এক চামচ ফোটান জল মিশিয়ে খাইয়ে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে এক আউন্স কমলালেবুর রসের সঙ্গে এক আউন্স ফোটান জল মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। জলের অংশ পরে কমাতে কমাতে শেষে শুধু কমলার রস দিতে হবে। শিশু যদি চায় তবে কমলার রসে একটু মিষ্টি দেওয়া যায়, কিন্তু কখনওই কমলার রস ফুটিয়ে খাওয়াতে নেই। তাতে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়ে যায়। ফলের রস-নিঙড়ানি-পাত্রে রস করা যায় অথবা একটা পরিষ্কার কাপড়েও রস নিঙড়িয়ে নেওয়া যায়। যদি কাপড়ে রস নিঙড়াতে হয় তবে কাপড়খণ্ডকে আগে পরিষ্কার জলে ফুটিয়ে তা শুকিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

মালটিভিটামিন এবং আয়রন উন্নয়ন সম্পূরণ : একমাস বয়স থেকে শিশুকে ভিটামিন খাওয়ানো আরম্ভ করতে হয়। বাড়ন্ত শিশুর পক্ষে শুধু দুধের মধ্যে উপযুক্ত ভিটামিন থাকে না। শিশুর পক্ষে ভিটামিন 'এ', 'ডি' এবং 'সি' বিশেষ প্রয়োজন। বেশির ভাগ মালটিভিটামিন ড্রপের মধ্যে ভিটামিন 'বি'ও থাকে।

মালটিভিটামিন ড্রপের শিশির মধ্যে ড্রপার থাকে, তাতে ০·৩ এম এল এবং ·৬ এম এল চিহ্ন থাকে। প্রথম দু মাসে একটু একটু করে বাড়িয়ে মালটিভিটামিন ড্রপ ·৩ এম এল পর্যন্ত দুধ খাওয়াবার আগে শিশুর সোজা মুখে ড্রপারে করে ঢেলে দিতে হবে। এটা দুধে মিশিয়ে খাওয়ালে দুধের স্বাদ পালটে যাওয়ার জন্য শিশু দুধ খেতে না চাইতেও পারে। ফলে তার বোতলের দুধ আর হয়তো শেষ হবে না। দুধ খাবার আগে না দিয়ে সুবিধাজনক যে কোনও সময়ে এই ড্রপ শিশুকে খাওয়ানো যায়। দুই মাসের পর এক বছর পর্যন্ত, যতদিন শিশু নানা জাতীয় খাদ্য যেমন—সবজী, তরিতরকারী, মাছ, ডিম, ফল ইত্যাদি ক্রমশ না খেতে শেখে, ততদিন পর্যন্ত মালটি-ভিটামিন ড্রপ ক্রমশ বাড়িয়ে ০·৬ এম এল পর্যন্ত মাপের পরিমাণে খাওয়াতে হবে।

চার মাস বয়সে বা যদি শিশু অপরিণত অবস্থায় জন্মে থাকে তবে তারও আগে শিশুকে আয়রন ড্রপ খাওয়াতে হবে, অবশ্য যদি ডিমের কুসুমের মতো আয়রনযুক্ত অন্য খাদ্য না দেওয়া হয়। দুধের আয়রন খুব কম থাকে। তদুপরি শিশুর শরীরের সঞ্চিত আয়রন চার মাস বয়সের পর থেকে কমতে সুরু করে। সুতরাং মালটি-ভিটামিন ড্রপ যে রকম মাপে দেওয়ার কথা বলা হল, সেই অনুযায়ী শিশুকে আয়রন ড্রপও দেওয়া উচিত।

শক্ত খাদ্য : শিশু যখন ৩-৪ মাসের হবে, তখন তাকে অপেক্ষাকৃত ঘন খাদ্য দেওয়া দরকার। কারণ (১) তখন শিশুর কেবল আর তরল খাদ্যে চলে না, (২) তখনও শিশুর আপত্তি করার মতো মতামত গড়ে ওঠে না, তাই সেই সময় থেকে চামচে করে ঘন খাদ্য খেতে দিলে, সে তাতে অভ্যস্ত হতে শিখবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শিশুদের ৬-৭ মাস পর্যন্ত শুধু দুধের ওপর রাখা হয়, তারা পরে শক্ত খাদ্য দিলে খেতে চায় না, থু থু করে ফেলে দেয়। কেন না সেই বয়সের মধ্যে তার খাওয়া সম্বন্ধে নিজের একটা মতামত ও অভ্যাস গড়ে ওঠে। তখন যেমনটি চাওয়া তেমনি খাবার খেতে না দিলে সে খেতে নারাজ হবে।

প্রথমে রেডিমেড সিরীয়াল জাতীয় খাদ্য (শর্করা) দিয়ে আরম্ভ করা সহজতম কাজ। এগুলো দামে সস্তা, তৈরী করাও সহজ।

কিন্তু সুজি প্রভৃতি সমান উপযোগী হলেও তা তৈরী করা ঝঞ্ঝাটের। এই প্রকারের কিছু রেডিমেড সিরীয়াল ফুড বেশ মিষ্টি এবং তাতে দুধ বা দুধ জাতীয় সিরীয়াল থাকে। এটা শুধু কিছু ফোটান জলে মিশিয়ে ঘন পেস্টের মতো করে খাওয়াতে হয়। দুধ না থাকা অন্যান্য সিরীয়াল ফুডে পরিমাণ মতো দুধের (যে দুধ খেতে শিশু অভ্যস্ত) সঙ্গে মিশিয়ে তাতে চিনি বা মধু দিয়ে খাওয়াতে হয়। বহু মা শিশুর দুধে খুব কম পরিমাণ সিরীয়াল খাদ্য মেশান। এতে শিশুর সিরীয়াল খাওয়া হয় বটে, কিন্তু দুধ বেশি থাকে বলে তা তরল হয়। ঘন খাদ্য চেটেপুটে খেতে সে অভ্যস্ত হয় না। অবশ্য অনেক ভাল বাচ্চা আছে যারা দুধ খেতে খেতেই ভাত ধরে ফেলে এবং দিব্যি এক গাল এক গাল করে ভাত খায়। তবে এ ধরনের সুযোগ না নিয়ে শিশুর মতামত গড়ে ওঠার আগেই উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত।

সিরীয়াল খাদ্যের সঙ্গে দুধ বা জল মিশিয়ে তাতে একটু মিষ্টি দিয়ে আধা ঘন লেইয়ের মতো খাদ্য তৈরী করতে হবে। এটা একবারে না করে পাতলা থেকে আরম্ভ করে আস্তে আস্তে ঘন থেকে ঘনতর করে খাইয়ে শেষে পায়েস বা ক্ষীরের মত ঘনত্বে নিয়ে আসতে হবে। প্রথম দিন চায়ের চামচের মাত্র এক চামচ দিয়ে আরম্ভ করতে হবে। সকাল ৯টায় শিশুকে দুধ খাওয়াবার আগে এই খাবার দিলে সুবিধে হবে। কি করে খেতে হয় শিশু তো তা প্রথমে জানে না। তাই সে সুরুতে এমনভাব করবে যেন এখুনি সেটা থু থু করে ফেলে দেবে। কারণ এতদিন সে তরল খাবার চুষে পান করতে অভ্যস্ত ছিল, এখন এক চামচ অপেক্ষাকৃত ঘন খাদ্য কিভাবে খেতে হয় তা তার শিখে নিতে একটু সময় নেবে। সুতরাং নতুন খাদ্যাভ্যাসের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পরে দেখা যাবে বেশির ভাগ শিশু খুব শীঘ্রই এই খাবার খেতে শিখে যাবে এবং তা উপভোগ করবে। ক্রমে ক্রমে ৪-৫ চামচ বা যতটা শিশু খেতে চায় ততটা সিরীয়াল তাকে দিতে হবে। ৪-৫ চামচ সিরীয়াল খেতে পারলে তার সঙ্গে আর বাড়তি দুধ না দিলেও চলে। শিশু ৫ মাস বয়সের হলে সন্ধ্যে বেলায় ৬টা নাগাদ তার ঘুম ভাব আসার আগে শক্ত খাদ্য দেওয়া যায়। যে শিশু রাত্রে খিধেয় কেঁদে ওঠে তার পক্ষে সন্ধ্যে বেলায় সিরীয়াল খাদ্য বিশেষ উপযোগী।

শিশু যখন সিরীয়াল খাদ্য খেতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন তার সঙ্গে পাকা কলা থেঁতলে বা চটকে খেতে দেওয়া ভাল। কলা খুব পুষ্টিকর। বাচ্চারা তা খেতে ভালবাসে। পাকা কলা ভাল করে থেঁতলে নিতে হবে। সিরীয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে বা আলাদা ভাবেও কলা খেতে দেওয়া যায়। আলাদা করে দিতে হলে কলার সঙ্গে একটু দুধ মিশিয়ে না দিলে শিশুর গিলে খেতে অসুবিধা হতে পারে।

আপেলের দাম বেশি এবং আপেলে পুষ্টি আনে খুব কম। আপেল সিদ্ধ করে চিনি মিশিয়ে খাওয়ালে শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য কমে। আপেল সিদ্ধ করে আলাদা খাওয়ানো যায় বা সিরীয়ালের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়। পাকা আম খুবই পুষ্টিকর, এতে প্রচুর ভিটামিন আছে। কলা যেমনভাবে খাওয়ানোর কথা বলা হল, তেমনি ভাবেই আমও খাওয়াতে হবে।

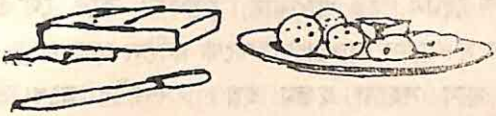
৬—৭ মাস বয়সের সময় শিশুর হাতে বিস্কুট ধরে তাকে নিজে খেতে এবং চিবিয়ে খেতে অভ্যাস করানো খুব ভাল। যদি এ সময় শিশুর দাঁত উঠতে থাকে তবে, সে শক্ত জিনিস চিবোতে চাইবে। তাতে তার দাঁত বের হতে সাহায্য করবে। তাই তখন আপেল ফালা ফালা করে কেটে বা টোস্ট করা পাউরুটি শিশুর হাতে দিলে ভাল হবে।

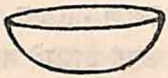
আমাদের দেশে অধিকাংশ মা অন্নপ্রাশন না হওয়া পর্যন্ত শিশুকে অন্য খাবার দিতে চান না। অভ্যাস না করালে শিশু শক্ত খাবার খেতে চাইবে না। অন্নপ্রাশনের নির্ধারিত সময়টা সুবিবেচিত কারণ তখনই শিশু বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণে উপযুক্ত হয়, খাদ্য হজমও করতে পারে।



যদি এ সব আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্ন না থাকে তবে ৪-৫ মাস বয়সের মধ্যে শিশুকে ডিমের কুসুম দেওয়া যায়। ডিমটিকে অন্তত ৭ মিনিট ফুটিয়ে শক্ত করে তার সাদা অংশটা বাদ দিয়ে শুধু হলুদ কুসুম দিতে হবে। সাদা অংশ খেলে অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবার মুরগীর ডিমের চেয়ে হাঁসের ডিমে অ্যালার্জির সম্ভাবনা বেশি থাকে। ডিম বেশী করে ফোটালে কুসুম সহজে হজম

হয়। প্রথম মটর দানার সমান হলুদ কুসুম দিয়ে আরম্ভ করে ক্রমশ তার পরিমাণ বাড়িয়ে খাওয়াতে হবে। সিরিয়াল খাদ্যের (শর্করা) সঙ্গে মিশিয়েও ডিমের কুসুম খাওয়ানো সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায়।





অনেক শিশু নুন দিয়ে কুসুম খেতে ভালবাসে। তাদের নুন দিয়ে দিতে হবে। ৬ মাস থেকে সমস্তটা কুসুম এবং এক বছরের পর সাদা অংশ সমেত ডিম শিশুকে খেতে দেওয়া যায়।

শিশুকে ৫ মাস বয়স থেকে সবজি খেতে দেওয়া যায়। আলু, সীম, গাজর, বীট, কাঁচাকলা ও টম্যাটো প্রভৃতি সিদ্ধ করে ধাতু-নির্মিত কোন ছাকনী বা প্লাস্টিকের ছাকনীর ওপর রেখে চামচ দিয়ে ভাল করে ঘষলে তলায় যে লেই-এর মত পড়বে সেটা দিতে হবে—শুধু সবজী সেদ্ধ-র জল দিলে কোনো উপকার নেই। কোন কোন শিশু সবজির নোন্তা লেই খেতে ভালবাসে। (মনে রাখতে হবে) বেশি নুন কিন্তু বাচ্চাদের খেতে দেওয়া ভাল না। বেশি করে নুন খেলে পরবর্তী সময়ে হাই ব্লাড প্রেসার হতে পারে বলে আজকাল বিশ্বাস করা হচ্ছে। সুতরাং শিশু বয়স থেকেই বাচ্চাদের যথাসম্ভব কম করে নুন খাওয়াতে অভ্যাস করান উচিত। অনেক শিশু আবার মিষ্টি সবজি খেতে চায়। তাদের মিষ্টি দিয়েই খাওয়াতে পারা যায়।

শিশুকে মাছ মাংস ধরাবার জন্য তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। ৭ মাস থেকে ১০ মাস বয়সের মধ্যে সব্জির মধ্যে একটু-একটু পরিমাণ মাছ মিশিয়ে খাওয়ানো আরম্ভ করা যেতে পারে। সে মাছ যেন টাট্‌কা হয়। এই জন্য বোধ হয় বাচ্চাদের মাগুর বা সিঙ্গি মাছ খেতে দেওয়া হয়। এই মাছ জ্যান্ত কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই মাছ শুধু আমাদের দেশেই পাওয়া যায়। বাচ্চারা অন্য মাছও বেশ হজম করতে পারে। যে মাছই তাদের খাওয়ানো হোক না কেন তা

যেন টাট্‌কা হয় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য এটাও দেখতে হবে যে সেই মাছের কাঁটা যাতে সহজে ছাড়ানো যায়। পরিবারের সকলে যে মাছ খান সে মাছ বাচ্চাকেও একটুকরা না খাওয়ানোর কোন কারণ নেই। মেটেও খুব ভাল খাদ্য। মেটে সিদ্ধ করে সব্‌জি যেমন করে খাওয়ায়, তেমনি করে থেঁতলে খাওয়াতে হবে। মাংস খাওয়া বাচ্চাদের পক্ষে কঠিন হবে।

ভাত খুব সহজে হজম হয়। সব্জীর মধ্যে ভাত পেস্ট করে বাচ্চাকে খাওয়ানো ভাল। কিন্তু অনেক বাচ্চা ভাত খেতে পছন্দ করে না। ভাত না খেলে মায়েরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। আমাদের দেশের অনেক জায়গায় ভাত ছাড়াই বাচ্চারা বেশ বেড়ে ওঠে। আলু ও গমের মূল্য ভাতের মত। সুতরাং ভাত খেতে না চেয়ে রুটি ও আলু যে শিশু খেতে চাইবে, তাকে তা-ই দিতে হবে। কিছুদিন পর দেখা যাবে সেই শিশু একটু একটু করে ভাতও খেতে চায়। তখন আর তাকে জোর করে ভাত খাওয়াবার সমস্যা থাকবে না।

ডালও প্রোটিনযুক্ত খাদ্য। আট থেকে দশ মাসের শিশুকে ডাল অনেকক্ষণ সিদ্ধ করে পেস্টমত হলে খেতে দিলে শিশু তা খেতে চাইবে, ডালের প্রোটিন থেকে উপকারও পাবে। অনেকে ভাবেন ঘন ডাল খাওয়ালে হজম নাও হতে পারে, তাই শিশুকে ডালের জল দেন। ডালের জলে বিশেষ কোন উপকার হয় না।

এক বছর বয়স হলে শিশুকে দিনে তিন বার প্রধান খাদ্য (মেইন মিল) খাওয়াতে অভ্যাস করানো দরকার। ঘুম থেকে উঠে শিশু যখন ক্ষুধার্ত থাকবে, তখন দুধ খেতে দিতে হবে। ৮-৯ মাসে তাকে সিরীয়াল জাতীয় ফুডের সঙ্গে ডিমের কুসুম বা পাকাকলা দেওয়া ভাল। দুপুরে সব্‌জি, ভাত বা আলু অথবা আটার রুটি, ডাল বা মাছ কিংবা মেটে খেতে দিতে হবে। অপরাহ্নে ঘুম ভেঙে খিদে পেয়ে কাঁদলে শিশুকে দুধ খাওয়াতে হবে। সঙ্গে দুই-একটা বিস্কুট তার হাতে দেওয়া যেতে পারে। তারপর বিকেলে খেলাধুলা করে বা বেড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত শিশুকে সিরীয়াল ফুড বা ডাল ও সব্‌জি —যেটা তার পছন্দ দিতে হবে। বাড়িতে কিছুক্ষণ খেলা করার পর ঘুমোবার আগে দুধ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়াতে হবে।

শিশুরা সকলে একরকম খেতে চায় না। তাদের বিভিন্ন রুচি ও অভ্যাস থাকতেই পারে। কিন্তু সবক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি

স্মরণে রাখা প্রয়োজন এবং সেটা হল—জোর করে কখনও শিশুদের খাওয়াতে নেই। অনিচ্ছায় জোর করে খাওয়ালে খাওয়ার প্রতি ভীতি ও এড়ানোর মনোভাব আসবে, শিশু খাওয়াতে বাধা দেবে। এভাবে মায়ের জোরাজুরি এবং শিশুর ক্রমাগত বাধাপ্রদানে অবশেষে খাওয়ার স্পৃহা সে একেবারেই হারিয়ে ফেলবে। উপরন্তু খাওয়াকে ভয় পাবে। খাওয়া এবং ভয় সম্পর্কযুক্ত হয়ে যাবে। আমি অনেক শিশুকে জানি, তারা মাকে খাবার হাতে এগোতে দেখলেই আর্তনাদ করে ওঠে। সুতরাং আবারও বলছি—খাওয়াটা একটা আনন্দের ব্যাপার। শিশু যদি খাবার দেখলে ভয় পায়, তার ফল কখনও ভাল হয় না। এরকম ঘটনা কখনও ঘটে নি যে মা জোর করে খাওয়ান নি বলে শিশু উপোস থেকেছে। শরীর সুস্থ থাকলে শিশুর খিদে পাবেই। তখন নানা ধরনের খাবার তার সামনে রাখতে হবে। পছন্দমতো সে খেয়ে নেবে। আর তা হবে বেশ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং খেতে-না-চাওয়া যে কোন শিশুকে জোর না করে কয়েকদিন খাবার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা উচিত কোন্ খাবার সে ভালবাসে। শীঘ্রই সে নিজেই ঠিক করে ফেলবে কোন্ খাবার সে খাবে। সেই খাবারের প্রতি সে ইচ্ছা প্রকাশ করবে, ইঙ্গিত করবে। তারপর আকাঙ্ক্ষিত খাবার পেলে ভয় না পেয়েই উপভোগ করে খাবে। সে খাওয়া তার কাছে হবে আনন্দ। অবশ্যি কোনও কোনও বয়ঃপ্রাপ্ত লোক যেমন থাকে, তেমনি কিছু শিশুও খেতে কম আগ্রহী থাকে। তখন তাকে মজার গল্প বলে, ছবিও খেলনা দেখিয়ে খাওয়ানো সহজ হয়। গল্প, খেলনা ও ছবিতে ভুলে শিশু যতক্ষণ খেতে চায়, ঠিক ততক্ষণই খাওয়াতে হবে। না খেতে চাইলে খাওয়ানো সেখানেই বন্ধ করে দিতে হবে।

পুষ্টির জন্য প্রয়োজন: খাদ্য শরীরের বৃদ্ধির জন্য প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও চর্বির মাধ্যমে শরীরের ক্যালরি উৎপাদন করে। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য এবং হাড়ের বৃদ্ধি ও রক্ত হওয়ার জন্য খাদ্য কিছু প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ শরীরে যোগান দেয়। একটি বয়স্ক লোকের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ পুষ্টিকর পদার্থ একটি বাড়ন্ত শিশুর শরীরের পুষ্টির জন্য প্রয়োজন, কারণ দৈনন্দিন খাবার হজম হওয়া এবং শরীর সুস্থ রাখা ছাড়াও শিশুর প্রয়োজন বৃদ্ধিলাভ করা। সাধারণত একটি শিশুকে যদি সহজ

স্বাস্থ্যকর খাদ্যের মাধ্যমে তার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি সরবরাহ করা হয় তাহলে তার শরীর প্রয়োজনীয় প্রোটিনও পাবে।

ক্যালরি: শক্তির পরিমাপের একক ক্যালরি এবং ক্যালরিপূর্ণ খাদ্য বলতে আমরা বুঝি খাদ্যে উদ্ভুত শক্তি এবং তাপের পরিমাণ। সাধারণ আহার্য সামগ্রীর খাদ্যমূল্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হওয়ার জন্য একটি খাদ্যতালিকা দেওয়া হলো। চর্বি, কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন অপেক্ষা দ্বিগুণ ক্যালরি শরীরে সরবরাহ করে। সেজন্য একটি অপুষ্ট শিশুর খাদ্যে তেল অথবা মাখন মাখানো উপকারী কিন্তু একটি অতিপুষ্ট শিশুর খাদ্যে বেশী চর্বি না থাকাই ভাল।

এক বৎসরের কম শিশুর প্রতি কি. গ্রা. ওজনের জন্য ১২০ ক্যালরির প্রয়োজন। এক বৎসরে সেই শিশুর একদিনে প্রয়োজন হয় ১০০০ ক্যালরি এবং পরবর্তীকালে প্রত্যেক বৎসর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত ১০০ ক্যালরির প্রয়োজন হয়। এইরূপে একটি পাঁচ বৎসরের শিশুর দৈনিক প্রয়োজন ১৪০০ ক্যালরি। একজন স্বাভাবিক পরিশ্রমকারী স্ত্রীলোকের দৈনিক ১৮০০ হইতে ২০০০ ক্যালরির প্রয়োজন হয় এবং একজন স্বাভাবিক পরিশ্রমকারী পুরুষের দৈনিক প্রয়োজন ৩০০০ ক্যালরি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, একটি এক বৎসরের শিশুর তার মায়ের খাদ্যের অর্ধেক পরিমাণ অথবা বাবার খাদ্যের এক তৃতীয়াংশ দৈনিক প্রয়োজন। যদিও শুনলে আশ্চর্য মনে হয় কিন্তু বস্তুত বিষয়টি বাস্তব সত্য। একটি শিশুর একবারে অথবা দু'বারে এই প্রচুর পরিমাণ খাদ্য খাওয়া সম্ভব নয় বলে তাকে বারবার পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো দরকার। খাদ্য-তালিকার থেকে খুব সহজেই বাড়ন্ত শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য নির্বাচন করা সম্ভব।

প্রোটিন: বৃদ্ধির জন্য প্রোটিন একান্ত প্রয়োজন। একটি শিশু তুলনামূলক ভাবে একটি বয়স্ক লোক অপেক্ষা বেশি প্রোটিন গ্রহণ করে কারণ শিশুর মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ এবং কিডনি এবং রক্তের বৃদ্ধির জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় প্রোটিনের পরিমাণ যদিও কম অর্থাৎ ১ বছর পর্যন্ত (শৈশব) শিশুর প্রতি কি গ্রা. দৈহিক ওজনের জন্য ২ গ্রাম প্রোটিনের দরকার এবং শৈশবের পর প্রতি কি গ্রামের জন্য ১'৫ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন। যাই হোক না কেন, অল্প পরিমাণ হলেও প্রোটিন শরীরের জন্য অত্যাবশ্যক।

মাতৃদুগ্ধের থেকে শিশু সঠিক পরিমাণ প্রোটিন খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারে। গরুর দুধ যদিও সদ্যোজাত বাছুরের উপযোগী কিন্তু নবজাত মানবশিশুর পক্ষে উপযোগী নয় কারণ ইহা প্রচুর পরিমাণ প্রোটিনসমৃদ্ধ। অ্যামিনো অ্যাসিডপূর্ণ প্রোটিনকে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন বলা হয়। অ্যামিনো অ্যাসিডেরাই একত্রে প্রোটিন প্রস্তুত করে। প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড বলতে সেই সমস্ত অ্যামিনো অ্যাসিডকেই বোঝায় যা শরীরে প্রস্তুত হয় না এবং সেজন্যই খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করা দরকার। জৈব প্রোটিন যেমন ডিম, মাছ, ইত্যাদি সব ধরনের প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডে পূর্ণ তাই এরা প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন বলে পরিচিত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনে সকল আবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না। উদ্ভিদজাতীয় খাদ্যশস্য এবং মটরে খুব কম ধরনের প্রয়োজনীয় প্রোটিন থাকে বলে এদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন বলা হয়। সাধারণত খাদ্যশস্য এবং ডাল আমরা একত্রে এবং মাছ ও মাংসের থেকে বেশী পরিমাণে গ্রহণ করি বলে একটি খাদ্যশস্য, ডাল এবং শাকসবজির পর্যাপ্ত মিশ্রণ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় প্রোটিন গ্রহণ করতে পারি এবং সেই কারণেই একটি নিরামিষাশী লোক একটি আমিষাশী লোকের মতোই সমান স্বাস্থ্যবান।

বেশীর ভাগ মাংস জাতীয় খাদ্যের প্রতি ১০০ গ্রামে প্রায় ২০ গ্রাম প্রোটিন, চাল, গম, ইত্যাদি খাদ্যশস্যের প্রতি ১০০ গ্রামে ১০ গ্রাম প্রোটিন এবং ডাল ও কড়াইশুঁটিতে প্রায় ২০ গ্রাম দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন থাকে। সয়াবীন সর্বাপেক্ষা প্রোটিন সমৃদ্ধ কারণ এর প্রতি ১০০ গ্রামে ৪০ গ্রাম প্রোটিন থাকে এবং বর্তমানে বাজারে আংশিক প্রস্তুত খাদ্য হিসাবে পাওয়া যায়।

চর্বি : চর্বি থেকে প্রোটিন এবং শর্করাজাতীয় খাদ্য অপেক্ষা দ্বিগুণ ক্যালরি সম্পন্ন খাদ্য পাওয়া যায়। সুতরাং, খাদ্যের ক্যালরি মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য খাদ্যে মাখন, ঘি অথবা তেল জাতীয় চর্বি ব্যবহার করা হয় এবং ইহা শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ত্বকের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। জৈব চর্বি যেমন মাখন এবং ঘি প্রচুর পরিমাণ সম্পৃক্ত চর্বি জাতীয় অ্যাসিড দ্বারা পূর্ণ এবং অত্যাধিক মাত্রায় গ্রহণ করলে বৃদ্ধ বয়সে উচ্চ রক্তচাপ অথবা হৃৎপিণ্ডের রোগ হওয়া সম্ভব। উদ্ভিদজাতীয় চর্বি অথবা

তেল যেমন বাদাম তেল, সরিষার তেল এবং সূর্যমুখী তেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে অসম্পৃক্ত চর্বিজাতীয় অ্যাসিড থাকে এবং সেজন্য উচ্চ রক্তচাপজনিত কোনও রোগ হয় না তাই রান্নার কাজে এই তেল ব্যবহার করা হয়।

শর্করা: শরীরে দ্রুত শক্তি এবং প্রয়োজনীয় ক্যালরি সরবরাহ করার জন্য শর্করাজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। যেহেতু ছোট শিশুরা সহজেই মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তাই হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চাদের মিষ্টিজাতীয় খাদ্য না খাওয়ানোই বাঞ্ছনীয়।

ক্যালসিয়াম: হাড় এবং দাঁতের বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন। একটি শিশুর দুধে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম রাখা হয়। যতোদিন পর্যন্ত না শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' গ্রহণ করে কিছু ক্যালসিয়াম শোষণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। সেজন্য শরীরে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম টনিকের প্রয়োজন হয় না।

লৌহ: লৌহের অভাবে রক্তাল্পতা রোগ দেখা দেয়। দুধে লৌহের পরিমাণ খুব কম। মায়ের দুধে লোহার পরিমাণ বেশী থাকে কিন্তু যেসব শিশু গরুর দুধ খায় তাদের শরীরে অতিরিক্ত লোহা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। ডিমের কুসুম, মাংসের লিভার এবং কাঁচা শাকসবজিতে লোহার পরিমাণ বেশী থাকে।

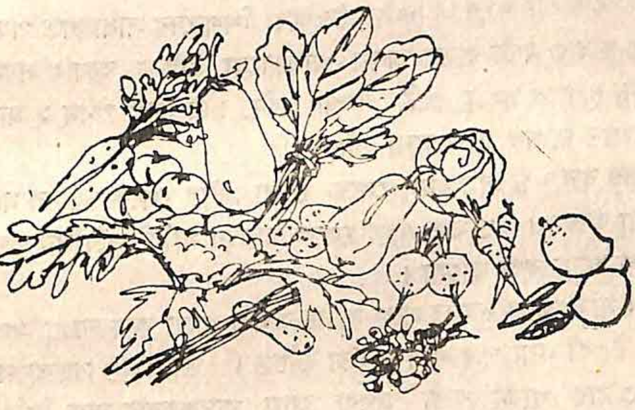
ভিটামিন: দেহের কোষকে সুস্থ, সতেজ রাখার জন্য অল্প পরিমাণে হলেও ভিটামিনের একান্ত প্রয়োজন। অতিরিক্ত ভিটামিন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে ডাক্তারের পরামর্শ মতো ভিটামিন শিশুকে খাওয়ানো উচিত। অধিকাংশ মায়েরা বিশ্বাস করেন যে তাদের শিশুর বৃদ্ধির জন্য কোনও ভালো টনিকের প্রয়োজন। ভিটামিন কিন্তু তা করতে পারেনা। একমাত্র যে খাদ্য থেকে আমরা প্রয়োজনীয় ক্যালরি গ্রহণ করতে পারি তাই-ই শরীরের পক্ষে উপকারী।

ভিটামিন 'এ' যা আমরা দুধ এবং দুধজাতীয় পদার্থে, ডিম এবং শাক্-সব্জীতে যেমন পুদিনা, বা ধনেপাতা ও হলদে রঙের ফলে এবং গাজর, আম ও পেঁপে জাতীয় পদার্থে পাই তা আমাদের চোখের জন্য প্রয়োজনীয়। এর সাহায্যে আমাদের চামড়া এবং শরীরের আরো অনেক অঙ্গ সজীবতা লাভ করে। ভিটামিন 'এ'-র

অভাবে অন্ধত্ব এবং রাতকানা ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। চর্মরোগ, ব্রঙ্কাইটিস এমন কি মূত্রাশয়ে সংক্রামক রোগও ভিটামিন 'এ'-র অভাবে দেখা দেয়।

ভিটামি 'সি' টাটকা ফলে বিশেষ করে কমলালেবু, মুসম্বি, পেয়ারা, শাকসব্জী ও টমেটোতে পাওয়া যায়। সাধারণত সূর্য-কিরণে এবং বেশী মাত্রায় সিদ্ধ করলে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়ে যায় তাই এই সমস্ত ফল সব সময় টাটকা এবং বেশী রান্না না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

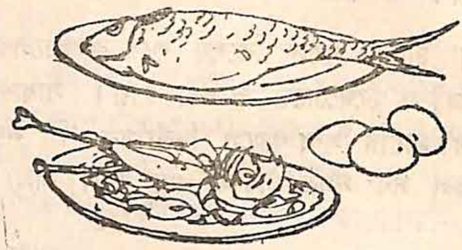
রিকেট রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং হাড়ের



বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন 'ডি' একান্ত প্রয়োজনীয়। অধিকাংশ বাবা-মা মনে করেন যে রোগা শিশুরা সবাই রিকেট রোগে আক্রান্ত। রিকেট রোগ হলে হাড়ের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং হাড় নরম এমনকি ভেঙেও যায়। যদি কোনও বাচ্চা বহুদিন ধরে পেটের অসুখে ভোগে এবং খাদ্যে উৎপন্ন ভিটামিন গ্রহণ করতে না পারে তাহলে সেও এই রিকেট রোগের শিকার হয়। ডিমের কুসুম এবং দুধে ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়। এছাড়াও সূর্যকিরণের সংস্পর্শে চামড়ায় ইহা তৈরী হয়।

অনেক ভিটামিনের একত্র মিশ্রণে ভিটামিন 'বি' প্রস্তুত হয়। ইহা অধিকাংশ খাদ্যশস্যে, মটরে এবং কিছু সবজিতে পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত মাত্রায় রান্না করলে এবং জলহীন অবস্থায় রাখলে এটির নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।



বিভিন্ন অবস্থায় শিশুর খাদ্য

জন্ম থেকে ৩/৪ মাস : অতি শৈশবে শিশুদের সাধারণত পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর খাওয়ানো উচিত অর্থাৎ সকাল ৬টা, ৯টা, দুপুর ১২টা, ৩টে, সন্ধ্যা ৬টা, ৯টা এবং প্রথম ২ মাসে রাত্রেও অন্তত দুবার খাওয়ানো উচিত।

ফলের রস ১ মাস বয়স থেকে বেলা ৯টার থেকে ১২টার মধ্যে খাওয়ানো উচিত। ১ মাস বয়স থেকে এছাড়া মাল্টিভিটামিন ড্রপও খাওয়ানো শুরু করা ভালো।

তিন মাস থেকে দুধের সঙ্গে সুজি অথবা রান্না করা সাগু অথবা কৌটোয় তৈরী করা খাদ্যশস্য দেওয়া উচিত। তার ২/৪ সপ্তাহ পরে দিনে ২/৩ বার পাকা কলা অথবা আম খাদ্যশস্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত। ৪ মাসের পর থেকে সুসিদ্ধ ডিমের কুসুম খাদ্যশস্যের সঙ্গে খাওয়ানো যেতে পারে। এইভাবে ৫ মাস বয়সে তার খাবার তালিকা হবে নিম্নরূপ :—

ঘুম থেকে ওঠার পর—৬ আউন্স দুধ।

সকাল ৯টায়	দুধ এবং ফলের সঙ্গে খাদ্যশস্য খাওয়ানো (ফল বলতে প্রধানত আম এবং কলাকে বোঝায়)।
সকাল ১১ টায়	কমলালেবুর রস।
দুপুর ১২ টায়	দুধ।
বেলা ৩ টায়	দুধ।
সন্ধ্যে ৬টায়	খাদ্যশস্য মেশানো দুধের সঙ্গে ডিমের কুসুম

রাত ৯টা থেকে ১০টায় দুধ।

সাত-আট মাস বয়সে ও তারপর : ৭।৮ মাস বয়সে বাচ্চাকে ভাত, ডাল এবং তরকারী খাওয়ানো উচিত! ৯।১০ মাসের সময় মাংস এবং মাছও দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে ক্রমশ মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা করা উচিত। যাতে ৯।১০ মাস বয়সে তার খাবার তালিকা নিম্নরূপ হয় :—

ঘুম থেকে ওঠার পর	— ৬-৮ আউন্স দুধ।
সকাল ৯টা	দুধ, ডিমের কুসুম, চটকানো কলা বা আম সহযোগে খাদ্যশস্য অথবা পাঁউরুটি মাখন বা ঘরে তৈরী রুটি।
দুপুর	— এক বাটি ভাত বা ২টো চাপাটি, আধ বাটি ডাল, টাটকা সবজী, টাটকা মাছ মাংস, মেটে বা দই।
দুপুর ৩টা--৪টা	— ৬।৮ আউন্স দুধ, পাঁউরুটি মাখন বা ঘিয়ে তৈরী চাপাটি বা সুজির হালুয়া বা একটা কলা।
সন্ধ্যা ৬টা—৭টা	— ভাত বা চাপাটি বা খিচুড়ি, তেল বা মাখনের সহযোগে সিদ্ধ সবজী। আধ বাটি ডাল, পুডিং পায়েস, ক্ষীর বা কাস্টার্ড বা ৬/৮ আউন্স দুধ।

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যের পুষ্টি মূল্য

নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	শর্করা	চর্বি	খনিজ পদার্থ / ভিটামিন
১	২	৩	৪	৫	৬
চাল	৩২৫—৩৪৫	৬—৮	৭৬—৭৯	·৫	ভিটাবিন 'বি'
গম	৩৪০—৩৪৫	১১—১২	৭০ - ৭৫	১ ৫	ভিটানিন 'বি'
মুগ ডাল	৩৩৪	২৪	৫৬	১·৩	ক্যালসিয়াম, ভিটামিন 'বি'
মুসুর ডাল	৩৪৩	২৫	৫৯	·৭	ভিটামিন 'বি'
রাজমা	৩৪৬	২৩	৬০	১·৩	ক্যালসিয়াম
সয়াবীন	৪৩২	৪৩	২০	১৯	ক্যালসিয়াম, লোহা, ভিটামিন 'বি'
আলু	৯৭	১·৬	২২	·১	ভিটামিন 'বি', ভিটামিন 'সি'
গাজর	৪৮	·৯	১০	·২	ভিটামিন 'এ'
বিনু	১৫৮	৭·৪	৩০	·১	ভিটামিন 'বি', ভিটামিন 'সি'
ফুলকপি	৩০	২·৬	৪	·৪	ভিটামিন 'সি'
শসা	১৩	·৪	২৫	·১	শূন্য
কড়াইশুঁটি	৯৩	৭·২	১৬	·১	ভিটামিন 'বি'
টমেটো	২৩	১·৯	৩·৬	—	ভিটামিন 'সি'
পালংশাক	—	—	—	—	ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি'
সর্ষে পাতা	—	—	—	—	ভিটামিন 'এ'
মুলো পাতা	—	—	—	—	ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি'
পুদিনা	—	—	—	—	ভিটামিন 'এ'
ধনে পাতা	—	—	—	—	ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি'
মেথি পাতা	—	—	—	—	ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি' ক্যালসিয়াম
	—	—	—	—	ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি' ক্যালসিয়াম
আমলা	৫৮	·৫	১৩	·১	ভিটামিন 'সি'
আপেল	৫৯	·২	১৩	·১	শূন্য
পাকা কলা	১১৬	১·২	২৭	·৩	ভিটামিন 'এ'
পেয়ারা	৫১	১	১১	·৩	ভিটামিন 'সি'
আঙুর	৭০	·৫	১৬	·৩	শূন্য
আম	৭৪	·৬	১৬	·৪	ভিটামিন 'এ'
মুসাম্বি	৪৩	·৮	৯	·৩	ভিটামিন 'সি'
কমলালেবু	৪৮	·৭	১০	·২	ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি'
ডালিম	৬০	১·৬	১৪	·১	শূন্য
পেঁপে	৩২	·৬	৭	·১	ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি'
মানুষের দুধ	৬৫	১·২	৭·৪	৩·৪	ভিটামিন 'এ', ক্যালসিয়াম
গরুর দুধ	৬৭	৩·২	৪·৪	৪·৪	ভিটামিন 'এ', ক্যালসিয়াম
মোষের দুধ	১১৭	৪·৩	৫	৮·৮	ভিটামিন 'এ', কালসিয়াম
মুরগীর মাংস	১০৯	২৬	—	·৬	—
ভেড়ার মাংস	৮৭	১৯	—	·৯	—
ডিম	১৭৩	১৮·৩	—	১৩·৩	ক্যালসিয়াম, লোহা, ভিটামিন 'এ'
মাখন	৭২৯	—	—	৮১	ভিটামিন 'এ'
বাদাম তেল	৯০০	—	—	১০০	ভিটামিন 'এ'
সরিষার তেল	৯০০	—	—	১০০	শূন্য
রুটি	২৪৫	৭·৮	৫১	·৭	

তৃতীয় অধ্যায়

নবজাতকের তত্ত্বাবধান

নাভি ঃ জন্মের সময় মাতৃজঠর ও শিশুর নাভির সঙ্গে সংলগ্ন নাড়ী কেটে দেওয়া হয়। এই নাড়ীতে জেলির মত একপ্রকার পদার্থ থাকে। এটা ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে শুকিয়ে ঝরে পড়ে যায়। শুকনোর দিনে এই নাড়ী শুকোতে কম সময় লাগে। বৃষ্টির দিনে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় নেয়। নাড়ীর চারিপাশ আর্দ্র হওয়ায় নাড়ীতে জীবাণু সহজেই জন্মায়। সুতরাং এর বিশেষ যত্ন গ্রহণ আবশ্যক। আগে যেমন নাড়ীতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হত, এখন সেরকম ব্যাণ্ডেজের প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে নাড়ী অনাবৃত রাখলেই তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। জন্মের পর শিশুকে স্নান করিয়ে নাড়ী এবং সেই স্থান ভালভাবে শুকিয়ে নেবার পর আর বিশেষ কিছু করার থাকে না। তবে ১ পারসেণ্ট মারকিউরোক্রোম সেখানে লাগিয়ে দিলে ভাল হয়। যদি নাড়ী শুকোতে দেরী করে তবে ডাক্তারী স্পিরিট বা অ্যালকোহল নাভির জায়গায় লাগিয়ে চিকিৎসকের নির্দেশমত কোন জীবাণু প্রতিষেধক পাউডার ছিটিয়ে দেওয়া আবশ্যক। নাভিতে পুঁজ জন্মালে, বিশেষত সে জায়গার চারিদিক লাল ও শক্ত হয়ে উঠলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক দেখানো উচিত।

চোখ : তুলোর দলা পরিষ্কার জলে ডুবিয়ে নিয়ে, সম্ভব হলে তুলোটা গরম জলে ফুটিয়ে নিয়ে শিশুর চোখ পরিষ্কার করা উচিত। সাধারণত আর কোন যত্নের প্রয়োজন নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় শিশুর একটা চোখে খুব জল জমছে। এছাড়া অন্য কোনও অসুবিধা নেই এবং সকালে পিচুটিতে চোখটি জুড়েও যাচ্ছে না। এর কারণ, চোখের জল নির্গমনের জন্য সরু নালি-পথ নাকের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। সেই নির্গমন-পথ মাঝে মাঝে আটকে যায়। তখন চোখে জল জমে। চোখের কোণা থেকে নাক পর্যন্ত দিনে তিন চার বার আস্তে আস্তে মালিশ করে দিলে নালিপথে জমা জল বেরিয়ে যাবে

এবং জল জমা বন্ধ হয়ে যাবে। চোখে যদি পিচুটি ধরনের কিছু জমে, তবে তুলো জলে ফুটিয়ে নিয়ে চোখ পরিষ্কার করে দিতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শমত চোখের লোশন লাগাতে হবে।

কান: কানের উপরিভাগ শিশুকে স্নান করাবার পর মুছে শুকনো রাখতে হবে। কানের ভিতরের অংশে জমে থাকা আঠার মত পদার্থ জোর করে বার করা ঠিক নয়। এটা কানকে রক্ষা করে।

নাক: শিশু মধ্যে মধ্যে হাঁচি দেয়। এর অর্থ তার ঠাণ্ডা লাগা নয় অবশ্যই। হাঁচি দিয়ে শিশুর নাক পরিষ্কার রাখা স্বাভাবিক ধর্ম। তার নাকে কফ শুকিয়ে থাকলে একটা তুলো মুড়িয়ে তেল বা ক্রীম লাগিয়ে কফকে নরম করে বার করে দিতে হবে।

জিহ্বা: সাধারণত বাচ্চাদের জিহ্বায় এক প্রকার সাদা প্রলেপ পড়ে। অনেক মা তাদের জিহ্বা পরিষ্কার করার জন্য উদ্বিগ্ন হন এবং মনে করেন যে জিহ্বা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। যে শিশুরা কেবল দুধই শুধু খায় তাদের জিহ্বায় এরূপ আস্তরণ পড়াই স্বাভাবিক। তবে লক্ষ্য রাখা দরকার যে শিশুর জিভের ওপর এবং ঠোঁট ও গালের ভিতর দই-এর মত সাদা সাদা দাগ পড়েছে কিনা। যদি তা দেখা যায়, তবে প্রথমে নিশ্চিত হওয়া উচিত যে সেগুলো শিশুর ঢেকুর দিয়ে তোলা দুধ কিনা। আঙুল পরিষ্কার করে সেই দাগ প্রথমে তোলার চেষ্টা করতে হবে। যদি সে ভাবে দাগ না ওঠে, তাহলে তা শিশুদের মুখ ও গলার ভিতরে একরকম ছত্রাকৃতি জীবাণু সংক্রমণ (থ্রাশ) হতে পারে—যা সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসককে দেখানো দরকার, না হলে এই সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে এবং শিশুর পক্ষে দুধ খাওয়ার সময় তা বড় যন্ত্রণাদায়ক হবে, ফলে দুধ খেতে কষ্ট হবে। এরকম হলে প্রত্যেকবার দুধ খাওয়াবার পর ২ পারসেণ্ট জেনশিয়ান ভায়োলেট অন্তত দুই সপ্তাহ যাবৎ শিশুর মুখে লাগাতে হবে। কারণ, উক্ত জেনশিয়ান ভায়োলেট লাগালেই দু-একদিনের মধ্যে ছত্রাকৃতি সংক্রমণ সেরে গেছে মনে হলেও তা আবার হয়।

অনেক মায়ের প্রসব পথে এই ফাংগাস (ছত্রাকের মত রোগ জীবাণু) থাকে। সেটা শিশুতেও সংক্রমিত হয়। সুতরাং মায়ের যদি ঘন প্রদর থাকে, তবে তারও চিকিৎসা করানো দরকার। ফাঙ্গাসে আক্রান্ত শিশু যদি মায়ের দুধ খায়, তবে তাঁর স্তনের বোঁটা নিয়মিত

পরিষ্কার করা ও শুকনো রাখা উচিত। আর যদি সে বোতলের দুধ খায়, সেক্ষেত্রে বোতল ও নিপ্‌ল পরিষ্কার জলে নিয়মিত ফুটিয়ে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

তেল মালিশ : আমাদের ভারতীয় মায়েরা শিশুদের তেল মালিশের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। শিশুরাও অবশ্য মালিশ উপভোগ করে। শীতের শুকনো দিনে তেল শিশুর চামড়ার রুক্ষতাকে দূর করে বটে। কিন্তু মনে রাখা দরকার তেলের প্রয়োজনীয়তা ওইটুকুই। যে কোন বিশুদ্ধ তেল একইভাবে চামড়াকে মসৃণ রাখার পক্ষে সহায়ক। তার জন্য চড়া দাম দিয়ে বিশেষ কোন দামী তেল কেনার দরকার হয় না। আমাদের মায়েদের বিশ্বাস—তেল শিশুর দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেহকে মজবুত ও দৃঢ় করে তোলে। বিভিন্ন তেল প্রস্তুতকারকগণও সেইরূপ দাবী করেন। সরষের তেল সবার ঘরেই থাকে কিন্তু শিশুর নরম চামড়ার পক্ষে এই তেল তীব্র ঝাঁঝালো হবে। ফলে তার দেহে গুটি বার হতে পারে। সেইজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় মাসে অপেক্ষাকৃত নরম কোনও শিশু-তেল ব্যবহার করে তার পরে সরষের তেল ব্যবহার করা নিরাপদ।

শিশুর স্নান : গ্রীষ্মের দিনে শিশুকে প্রতিদিন সাবান দিয়ে স্নান করানো দরকার। বেশি গরম পড়লে সন্ধ্যের দিকে শিশুর দেহকে দ্রুতভাবে একবার স্পঞ্জ করিয়ে জামা পাল্টিয়ে দিলে তার বেশ আরাম লাগবে এবং ঘামাচি হবে না। ঘামাচি শিশুর পক্ষে বড় কষ্টদায়ক। শিশুদের সবসময় শুয়ে থাকতে হয়, তাদের হাত-পাও থাকে গুটানো। হাত-পায়ের ভাঁজে ঘাম জমে ভিজে থাকে। যেকোন ভিজে জায়গায় রোগজীবাণু সহজে জন্মায়। সুতরাং গরমকালে প্রতিদিনই শিশুকে স্নান করিয়ে তার শরীরের ঘাম মুছে পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। শীতকালে রোজ স্নান করাবার প্রয়োজন নেই। যদি তার ন্যাপকিন পরার জায়গা মল-মূত্রে নষ্ট হয় সেখানটা পরিষ্কারভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। তবে শীতের সময়ও যদি খুব দ্রুতহাতে শিশুকে উষ্ণ জলে স্নান করানো যায়, তাতে ক্ষতি হয় না। বরঞ্চ গা মোছানোর চাইতে সে কাজ সহজ। খুব ঠাণ্ডা পড়লে বাচ্চার চুল ভিজানো উচিত নয়। কেননা চুল খুব শীঘ্র শুকোয় না এবং ঠাণ্ডা থাকে।

বাচ্চার স্নান করানোর আগে স্নানের জলের তাপ জলে আঙুল ডুবিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। সামান্য গরম জলে স্নান করান উচিত। অনেকে স্নানের জল রোদ্রে রেখে গরম করেন। এতে বিশেষ কোন উপকারিতা নেই। যা হোক শিশুর স্নানের জলের তাপমাত্রা যেন সুবিধানুযায়ী হয়। গ্রীষ্মকালে কলের জল সাধারণত যথেষ্ট গরম থাকে।

বাচ্চা যখন খুব ছোট, তখন তার স্নান দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। প্রথমে বাচ্চার মুখ পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সাবান লাগিয়ে চটপট ধুয়ে নিয়ে গা মুছিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। পাউডার গায়ের ঘাম শুষে নিতে সাহায্য করে। তাই পাউডার দিলে ঘামাচি প্রতিরোধ করা যায়।

বাচ্চা যখন বড় হয়, তখন তারা বসে জল নিয়ে খেলা করে, স্নান করতে ভালবাসে। গরমের দিনে তাদের সেইভাবে স্নান করতে দিলে কোন ক্ষতি নেই। গরমে যদি শিশুর গায়ে ঘামাচি হয়, তার স্নানের জলে সামান্য সোডি বাইকার্ব দিলে উপকার হবে। এক কাপ জলে চায়ের চামচের এক চামচ সোডি বাইকার্ব গুলে জলে মিশিয়ে নিতে হবে।

বেলা ১২টা নাগাদ দুপুরবেলাকার খাওয়াবার আগে শিশুকে স্নান করানোই বিধেয়।

শিশুর ঘুম : প্রায় শিশুই প্রথম দুই মাসে দিন রাত্রের অধিকাংশ সময়ে ঘুমিয়ে কাটায়। যখন তাদের খিদে পায়, তারা জেগে-ওঠে, খাবার খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। কিছু শিশু আছে যারা প্রথম থেকেই কম ঘুমায়। শিশুর ঘুমের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। প্রথম দুই মাসে অধিকাংশ শিশু দিন ও রাত্রের পার্থক্য বোঝে না। তারা দিনের বেলায় ক্রমাগত ঘুমায়, খাওয়ার জন্য জাগে না। বেশির ভাগ রাত জেগে কাটায়। এই সমস্যা মাস দুয়েকের পর সাধারণত থাকে না।

ক্রমে ক্রমে শিশুর ঘুম কমে যাবে। সে জেগে থেকে তার পরিবেশকে দেখতে আগ্রহী হবে। দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায় প্রায় শিশুই কাঁদে। তখন তারা ঘুমাবেও না, বিছানায় শুয়ে দিনের বেলাতে যেমনটি খেলা করে তেমনি খেলা করতেও চাইবে না।

শিশুরা তখন খিটখিটে হয়, অনেক সময় পেটের ব্যথায় কষ্ট পায় আর মায়েদের কোলে করে ঘুরে ঘুরে অনেক কষ্টে তবে ঘুম পাড়াতে হয়। ছয় মাসের পর তারা সাধারণত দিনে দু'বার ঘুমায়। সকাল নটা নাগাদ খাওয়ার পরে শিশুরা একটা ঘুম দেয়। এই ঘুমটার স্থায়িত্ব নির্ভর করে রাত্রে তারা কি রকম ঘুমিয়েছে, তার ওপর। আর একবার দুপুরের খাবার পরে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোয়। ঘুমের নিয়মটা বাচ্চাদের নিজেদের নিয়মেই অনেকদিন ধরে চলে। সব বাচ্চা এক হয় না। এই বয়সে বাচ্চাদের সন্ধ্যের সময় জাগিয়ে রেখে যখন বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখনই ঘুমোতে দেওয়া ভাল। তাহলে সারারাত সে ঘুমোবে।

মোটামুটি দেড় বছর বয়সের পর বাচ্চারা দিনে একবারই ঘুমোয় এবং তা দুপুর বারোটার পর। সেই সময়কার ঘুম ২-৩ ঘণ্টা হওয়া উচিত। না হলে চঞ্চল শিশুদের কাছে দিনটা হয় ক্লান্তিকর। কাজে ব্যস্ত মায়েদের কাছেও বাচ্চার এই ঘুমটুকু বিশ্রামের সময়।

অনেক শিশু উপুড় হয়ে শুয়ে আরাম পায়। "এটা তাদের স্বাভাবিক অবস্থান।" এভাবে শুয়ে তাদের পেটের ব্যথা-বেদনারও উপশম হয়। উবু হয়ে শোয়া শিশু বমি করলে বমিটা সোজা বিছানায় পড়ে এবং বমিতে তার শ্বাসরোধ হয় না। মায়েরা অবশ্য অনেকে শিশু উবু হয়ে শুলে সন্তানের শ্বাসকষ্ট হবে ভেবে উদ্বিগ্ন হন। কিন্তু একেবারে অপরিণত শিশুও উবু হয়ে শুলেও মাথা কাত করেই রাখে। সমতল জায়গায় মাথার বালিশ ছাড়াই শিশুদের শুতে দেওয়া উচিত। অনেক সময় বালিশের চাপে তাদের শ্বাসরোধ হয়। শিশু ঘুমালে পরিবেশ অহেতুক নিস্তব্ধ রাখার দরকার নেই। বাড়ির স্বাভাবিক শব্দ কথাবার্তার মধ্যেও নবজাত শিশু দিব্যি ঘুমোতে পারবে। কেবলমাত্র তীক্ষ্ন কোন শব্দেই তার ঘুম হঠাৎ ভেঙে যাবে। যদি প্রথম থেকে শিশুর ঘুমের সময় কথাবার্তা ও স্বাভাবিক শব্দ ইত্যাদি বন্ধ রেখে সব নিস্তব্ধ চুপচাপ রাখা হয়, তবে বড় হয়েও সে সামান্য শব্দেই জেগে উঠবে এবং সেটা পরিবারের অবশিষ্ট সকলের পক্ষে সমস্যার কারণ হবে। একই কারণে নবজাত শিশুর ঘুমের সময় লাইট নিভিয়ে অন্ধকার করে রাখা ঠিক নয়।

তাহলে পরে যতক্ষণ না ঘরের আলো সব নিভবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঘুমাতে পারবে না।

খেলা: কৃত্রিম সমাজের মায়েদের চেয়ে আমাদের সাধারণ ঘরের ভারতীয় মায়েরা তাঁদের শিশুদের সঙ্গে অনেক বেশি সহজ সরল ব্যবহার করে থাকেন। প্রথম থেকেই তাঁরা শিশুর কাছে গান করেন, কথা বলেন এবং স্বাভাবিক আচরণ করেন। যার ফলে শিশু সাহচর্য পায় ও নিরাপদ বোধ করে। মাস দেড়েক বয়স হলেই সে অবশ্যই আপনার দিকে তাকাবে এবং আপনার হাসি ও কথার প্রত্যুত্তরে সেও হেসে সাড়া দেবে। এটা একটা অনাবিল আনন্দের সময়। এই সময় থেকেই দেখবেন সে সঙ্গী-সাহচর্য চাইবে এবং তার সঙ্গে কথা বললে খুশীর আওয়াজ দিয়ে আনন্দে দেহকে আন্দোলিত করবে।

দুই মাস বয়সে শিশু ঝোলানো রঙীন জিনিস দেখে বেশ উপভোগ করতে শিখবে। মায়েরা রঙ-বেরঙের বেলুন এবং ঝুনঝুনি ঝুলিয়ে রাখেন। শিশুরা সর্বদাই বাইরে বেরুতে ভালবাসে। তাদের গাছের তলায় নিয়ে গেলে পাতার নড়া দেখে তারা বিমোহিত হবে। চার মাস বয়সে শিশু সব জিনিস ধরবার জন্য চেষ্টা করবে যদিও তার লক্ষ্য স্থির থাকবে না, তবুও সে ক্রমাগত চেষ্টা করে যাবে। প্লাস্টিকের লাট্টু, ঝুনঝুনি শিশুর নাগালের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখলে তারা নিজেরাই তা নিয়ে আনন্দে খেলতে পারবে। মায়েরা সারাদিন শিশুর তদ্বির তদারক করেন, খাওয়ান, স্নান করান, ঘুম পাড়ান এবং স্বাভাবিক ভাবেই আদরের কথা বলে তাকে কত আদর করেন। ফলে শিশু স্নেহশিক্ত ও তৃপ্ত হয়। অনেক পিতামাতা বা আত্মীয় নবজাত শিশুকে পেয়ে আনন্দে এত আত্মহারা হন যে তাঁরা সব সময় শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে খেলা দেন। এতে শিশু ভবিষ্যতে সব সময় চিত্তবিনোদন দাবী করবে, একা রাখলেই কেঁদে উঠবে। সুতরাং শিশুকে লালন-পালনের সময় যথেষ্ট স্নেহ ভালবাসা দেখান উচিত, কিন্তু বাকী সময়ে তাকে শান্তিতে নিজে খেলতে দেওয়া প্রয়োজন। কাজকর্ম করার ফাঁকে শিশুর সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু তাকে সর্বদা আনন্দ প্রদানের জন্য নিযুক্ত থাকার দাবী করার সুযোগ দেওয়া ঠিক নয়। ৫-৬ মাস বয়সে সমস্যা হবে আর-এক। তখন সে যা পাবে তাই মুখে পুরে ফেলবে। সুতরাং প্লাস্টিক বা রবারের এমন খেলনা শিশুর সামনে রাখতে হবে যাতে সে তা

গিলে না ফেলতে পারে। সেই খেলনাগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে শিশুর কাছে রাখা উচিত। যখন সে আরও বড় হবে তখন সে খেলার জন্য রান্নার বাসন, টিনের খেলনা, চামচ ইত্যাদি সাধারণ জিনিসপত্র নিয়ে খেলতে পছন্দ করবে। বেশি দামী খেলনা কেনা অপচয় মাত্র। কারণ বাচ্চারা গৃহস্থালীর জিনিসপত্র নিয়েই খেলতে ভালবাসে, দুম করে ছুঁড়তে পারে, ছড়াতে পারে ও তাতে আনন্দ পায়। তাছাড়া পুরানো খেলনার ওপর শিশুর আকর্ষণ থাকে না। বাচ্চার খেলা করা আমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর শরীরের ও মনের বিকাশ ঘটে। কোনও প্রতিষ্ঠানে বা অনুরূপ কোনও স্থানে যেখানে উদ্দীপক পারম্পর্য অনুপস্থিত, সেরকম জায়গায় শিশু প্রতিপালিত হয়ে নিজের মনে নিজে বেড়ে উঠলে তার বিকাশ অনেক বিলম্বিত হয়।

শিশুর মলত্যাগ : জন্মের পর প্রথম দু-একদিন শিশু সবজে কালো আঠা আঠা মল ত্যাগ করে। তাকে মেকোনিয়াম বলা হয়। তৃতীয়-চতুর্থ দিনে সেই মেকোনিয়াম হলুদ রঙে পরিবর্তিত হতে থাকে। যদি শিশু বুকের দুধ খেয়ে থাকে, তবে সে তারপর থেকে সোনালী হলুদ মলত্যাগ করবে। এই মল ঈষৎ টক হলেও দুর্গন্ধ হয় না, সাধারণত লেই-এর মত ঘন। কিন্তু প্রথম কয়েকদিন শিশুর মল কেটে যাওয়া দই-এর মত জলকাটা হতে পারে। এটা হওয়া স্বাভাবিক যদি শিশুর মল পরে জলীয় ও সবুজ না হয়। মলত্যাগ করার কিছুক্ষণ পর মল সবজে হলে এবং পরিহিত ন্যাপকিনে সবুজ দাগ লাগলেও তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঠিক মলত্যাগের সময় যদি তার মল জলীয় এবং সবুজ হয়, কিংবা আম থাকে, তবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। বোতলে দুধ খাওয়া শিশুর মল প্রায়ই সাদাটে ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। বুকের দুধ খেয়ে থাকা ও শুধু বোতলের দুধ খাওয়া শিশুদের দিনের মধ্যে মলত্যাগের সময় সংখ্যায়ও বহু পার্থক্য থাকে। কোনও শিশু হয়ত সাধারণত দিনে একবার স্বাভাবিক ভাবে মলত্যাগ করল, অন্য কোনও একদিন হয়তো প্রায় প্রত্যেকবার খাবার পরেই মলত্যাগ করল বা করতে চাইল। তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই যদি মলের ঘনত্বে সমভাব থাকে। বুকের দুধে পালিত শিশু ঘন ঘন মলত্যাগ করে, অপরদিকে টিনের

দুধে বা গরুর দুধে বড় হওয়া শিশুর প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্যের ধাত থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগা শিশুকে দিনে ৩-৪ বার জলে চিনি বা মিশ্রি বা মধু দিয়ে দুধ খাবার মাঝে মাঝে দিলে উপকার হয়। এক মাস বয়স হলে শিশুকে ফলের রস এবং পরে (তিন মাসের সময়) আপেলসিদ্ধ জলের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে খাওয়ালে কোষ্ঠকাঠিন্যের উপকার হবে। শিশু যখন সব্জী ও ফল খেতে আরম্ভ করে, তখন তার মলের সঙ্গে প্রায়ই সেগুলো হজম না হয়ে পড়তে পারে, সেটা কোনও ক্ষতি করে না যদি শিশু প্রকৃতই পাতলা মল ত্যাগ না করে। যদি পাতলা পায়খানা হয়, সেক্ষেত্রে আরম্ভ করা নতুন খাদ্য ২-৪ সপ্তাহ বন্ধ রেখে পরে আবার সেগুলো খাওয়াতে চেষ্টা করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সংক্রামিত রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা

গুটি বসন্তের টীকা: আজকাল এই টীকা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না, কারণ পৃথিবীর কোনো দেশেই এখন এই বসন্তের খবর পাওয়া যায় না। তবে যদি কখনও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এই টীকা নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে টীকা দেবার আগে ভাল-ভাবে দেখে নিতে হবে যে তার চামড়ায় অন্য কোন গুটি জাতীয় কিছু বের হয়েছে কিনা। যদি শিশুর একজিমা থাকে, তবে তা না সারা পর্যন্ত বসন্তের টীকা দেওয়া একান্ত নিষেধ। এমনকি যাদের টীকা নিতে হবে তাদের একজিমা হওয়া শিশুর কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে। প্রাথমিক বসন্তের টীকা দিতে হলে শিশুকে মাত্র একটি টীকা দিলেই যথেষ্ট হবে। টীকা দেওয়া জায়গাটাকে পরিষ্কার এবং শুকনো রাখতে হবে। এছাড়া অন্য কোনও বিশেষ যত্নের প্রয়োজন নেই। উরুর ওপর টীকা দিলে সংক্রমণের সুযোগ থাকে, কিন্তু শিশু যদি মেয়ে হয়, তবে বাহুর বদলে উরুতে টীকা দেওয়াই হয়তো অনেকে পছন্দ করেন, কারণ বাহুতে দিলে একটা স্থায়ী দাগ থেকে যায়। টীকার স্থান পরিষ্কার রাখতে হবে এবং সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যাতে শিশুর মলমূত্র সেখানে না লাগে।

বসন্তের টীকা কার্যকর হলে প্রথমে সেই স্থান ঈষৎ লাল হয়ে উঠবে, তৃতীয় থেকে পঞ্চম দিনে টীকা গুটি নেবে। খুব দ্রুত সেই গুটি পরিষ্কার জলের মত তরল পদার্থে পূর্ণ হয়ে যাবে, যা পরে পুঁজে রূপান্তরিত হয়। সমগ্র জায়গাটা লাল ও গরম হয়ে উঠবে। অষ্টম থেকে দশম দিনগুলোতেই সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয়। তখন শিশু খিটখিটে হয়, তার জ্বরও হতে পারে। চিকিৎকের কাছ থেকে বেদনা ও জ্বরের উপশমের ওষুধ এনে শিশুকে খাওয়ানো চলে। ১০ দিনের পর টীকা শুকোতে আরম্ভ করে, তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে যায়। এর কোন অন্যথা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। প্রথমবারের টীকা যদি কার্যকর না হয়,

তবে শিশুকে পুনরায় টীকা দেওয়া উচিত। একবার টীকা দিলে তিন বছর অন্তর অন্তর টীকা দিলেই চলে।

বি. সি. জি. (ব্যাসিলাশ্ অফ্ কাল্‌মেট অ্যাণ্ড গুয়েরিন) টীকা :

আমাদের দেশে জন্মের পর টি, বি, রোগের প্রতিষেধক টীকা দেবার জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোনও কোনও হাসপাতালে তা দেয়। তবে শিশু যদি টি, বি,-তে আক্রান্ত কোনও ব্যক্তির সংস্পর্শের আওতার বাইরে সুরক্ষিত থাকে, তবে এই টীকা শিশুর বাইরের মানুষের সংস্পর্শে আসার পর অর্থাৎ স্কুলে যেতে আরম্ভ করার পর দিলে ভাল হয়। তার আগে অতি শৈশবে বি, সি, জি, টীকা দেবার প্রয়োজন হয় না। এতে অনেক সময় রোগ নির্ধারণেও অসুবিধা দেখা দেয়। অত অল্প বয়সে টীকা দিলে অনেক সময় গ্ল্যাণ্ড ফুলে তাতে দীর্ঘস্থায়ী পুঁজক্ষরণ ঘটতে পারে। বড় হয়ে টীকা নিলে তার সম্ভাবনা কম। যা হোক্ টি, বি, রোগ আমাদের দেশে খুব হয়। ঘনবসতি অঞ্চলে যেখানে বহুলোকের মধ্যে শিশুকে বাস করতে হবে, সেক্ষেত্রে সময়মত টি, বি, প্রতিষেধক টীকা শিশুর নেওয়া ভাল। টি, বি,-র টীকার জায়গায় আঁব মত হয় এবং কয়েক সপ্তাহ থাকে। অনেক সময় জায়গাটা ফেটে গিয়ে রস অথবা পুঁজ বেরোতে পারে। এটা এই টীকার একটা স্বাভাবিক অবস্থা। তবে যদি দেখা যায়, পুঁজের পরিমাণ একটু বেশী দিন ধরে একই রকম রয়েছে এবং সেই সঙ্গে শিশুর বগলে আঁবের মত গ্ল্যাণ্ড ফুলেছে, তবে ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে।

ট্রিপল অ্যান্টি-জন : কিছুদিন পূর্বেও শিশুদের ক্ষেত্রে হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া এবং ধনুষ্টংকার মারাত্মক ছিল। কিন্তু বর্তমানে ট্রিপল অ্যাণ্টিজেন ইনজেকশনের মাধ্যমে এই রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। এই ইনজেকশনের মধ্যে হুপিং কাশির নিহত জীবাণু এবং ধনুষ্টংকার ও ডিপথেরিয়ার বিষাক্ত জীবাণুকে নির্বিষ করে দেওয়া থাকে। নবজাত শিশুর দেহে হুপিং কাশির প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা থাকে না, ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্টংকার রোগের প্রতিরোধক ক্ষমতা সামান্য থাকে যদি মায়ের ভিতরও সেই রোগ প্রতিরোধক শক্তি থেকে যায়। সেই জন্যই গর্ভবতী অবস্থায় মাকে টিটেনাস টক্সয়ড ইনজেক্শন দিয়ে তার ভাবী সন্তানের এই

ক্ষমতা উন্নত রাখার জন্য চিকিৎসকগণ শেষ বুস্টার ডোজটি দেন। রোগ আক্রমণের পর প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে আরম্ভ করলেও রোগের ভয়াবহতা ভীষণ ভাবে থেকেই যায় এবং পুরো চিকিৎসার পরেও অনেক সময় জীবন ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় না।

পোলিও টীকা: পোলিও টীকা এখন খাইয়ে দেওয়া হয়। আজকাল একে "সেবিন ভ্যাকসিন" বলে। এই ভ্যাকসিনে রয়েছে পোলিও রোগের দুর্বল ও অকেজো করা জীবন্ত জীবাণু। এই কোর্সও তিন মাস বয়সে আরম্ভ করা যায়। এক মাস অন্তর প্রত্যেকটি ডোজ দেওয়া হয়। বুস্টার ডোজ একবার এক বৎসর পরে দিয়ে পুনরায় ৪-৫ বৎসর বয়সে দেওয়া হয়। ট্রিপল অ্যান্টিজেন ও পোলিও ভ্যাক্‌সিন একই সময় দেওয়া যেতে পারে। তার জন্য কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় না। অথবা ট্রিপল অ্যান্টিজেন শুরু করার এক মাস আগে পোলিও খাওয়ানো শুরু করা যেতে পারে। অর্থাৎ শিশুর বয়সের ৬-৮ সপ্তাহ সময় থেকে। পেটের অসুখ থাকলে পোলিও দেওয়া উচিত নয়। আগেকার দিনে বিশ্বাস ছিল যে বুকের দুধের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াকালীন সময়ে পোলিও দেওয়া উচিত নয়, কেননা অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের মত শিশুর মাও পোলিও রোগের প্রতিষেধক শক্তি অর্জন করেছেন। তাঁর স্তনিঃসৃত দুধের জীবাণু-প্রতিরোধী শক্তি শিশুকে খাওয়ানো পোলিও টীকার অন্তর্ভুক্ত পোলিও জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে টীকা দেওয়াকে কমজুরি করে ফেলবে। বর্তমানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বুকের দুধের শিশু এবং বুকের দুধ না খাওয়া শিশু—উভয়েই এই টীকা নিলে উভয়ের পোলিও জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা এক হয়। মনের খুঁতখুতি মেটাবার জন্য পোলিও টীকা নেওয়ার তিন ঘণ্টা আগে ও পরে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখলে মন্দ হয় না। অবশ্য অন্যান্য দুধ বা খাদ্য শিশু তখন খেতে পারে। পোলিও টীকা না নেওয়া বা দেরিতে নেওয়া উভয়েই অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ যদি শিশু পোলিও রোগে একবার আক্রান্ত হয় তাহলে তার নিরাময়ের কোন চিকিৎসা নেই। পোলিও প্রতিষেধক নেওয়ার পরও পোলিওতে শিশু আক্রান্ত হতে পারে তবে তার তীব্রতা খুবই কম হবে।

হামের টীকা : এতে খুব দুর্বল করা হামের জীবাণু থাকে। এই টীকা দিলে জ্বর হয়, গায়ে খুব ছোট ছোট গুটি দেখা যায়। কিন্তু হামের ভয়াবহ জটিলতা যেমন—এনকেফেলাইটিস এবং ব্রেণের মৃদু ক্ষতি ইত্যাদি হওয়ার ঝুঁকি থাকে না যা কখনো কখনো হামে আক্রান্ত হলে শিশুর হয়ে থাকে। সুতরাং সম্ভব হলে হামের টীকা শিশুকে ১২ মাস বয়স হলে দিয়ে দেওয়া ভাল। একটা টীকা দিলেই কাজ হয়। অবশ্য আমাদের দেশে শিশুরা ১২ মাস বয়স হবার আগেও হামে আক্রান্ত হতে পারে। এবং যেহেতু ছোট বয়সে এই রোগের প্রকোপও অনেক বেশী ভয়াবহ, সেইজন্য এই টীকা শিশুর ৯ মাস বয়সেই দিয়ে দেওয়া ভাল। এক্ষেত্রে দুটো ডোজের প্রয়োজন। দ্বিতীয় ডোজটা দেওয়া হয় শিশুর ১৫ মাস বয়সে।

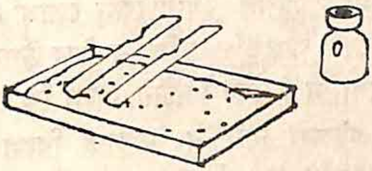
এখন আমাদের কয়েকটি শহরে (MMR) এম, এম, আর, ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে। এটা আরও উন্নত ধরনের এবং এই ভ্যাকসিন মামুস ও জার্মানী হাম দুটোকেই প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এটা অবশ্য দ্বিতীয় ডোজের বিকল্প—অর্থাৎ এটা শিশুর ১৫ মাস বয়সের পরেও দেওয়া হয়।

টাইফয়েড ও কলেরার টীকা : টাইফয়েড ও কলেরা রোগের মিলিত টীকা এ বি সি নামে পরিচিত। টি এ. বি. সি. (T. A. B. C.) অর্থে টাইফয়েড (T), প্যারাটাইফয়েড 'এ', ও প্যারাটাই-ফয়েড 'বি' (A. B.) এবং সি (C.) দ্বারা কলেরা বোঝায়। এটা দুঃখের যে এর মধ্যে টাইফয়েড প্রতিরোধী অংশই প্রকৃত কার্যকরী হয়। অবশিষ্টাংশ প্রচণ্ড ব্যথা এবং জ্বরের কারণ হয়।

প্রথম টি. এ বি. সি. (T. A. B. C.) টীকা শিশুর তিন বছর বয়স পার হলে সাধারণত দেওয়া হয়। এর আগে শিশু খুব একটা বাইরে বার হয় না, তার খাদ্যও মোটামুটি বাড়িতে তৈরী খাবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যদিও বা তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, এই সব কারণে শিশুর রোগাক্রমণও তীব্র হয় না। শিশুর পক্ষে এই টীকা দুই ভাগে ভাগ করে ১০ দিন থেকে ৪ সপ্তাহ বিরতিতে নেওয়া ভাল। এই পদ্ধতিতে টি. এ. বি. সি. নিলে তা বেশী কার্যকরী হয় এবং একবারে দেওয়ার থেকে কষ্টও কম হয়। যদিও এই টীকায় টাইফয়েড প্রতিরোধী শক্তি তিন বছর স্থায়ী হয়, তবু আমাদের দেশে, যেখানে টাইফয়েড অতি বেশি হয় সেখানে

রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করা হয়। শিশুর জীবনের প্রথম কয়েকটা মাস সে যাতে কোনও হুপিং কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে না আসে, সেজন্য তীক্ষ্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য, কেন না এটা একটা গুরুতর রোগ।





তিন মাস পার হলে শিশুকে ট্রিপল অ্যান্টিজেন ইনজেকশন দিতে আরম্ভ করা উচিত। এর আগে তার প্রতিরোধ প্রণালী অপরিণত থাকে বলে সন্তোষজনক ফল নাও ফলতে পারে। কিন্তু তিন মাস অতিক্রম করলে যখন শিশু মাতৃলব্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিশেষভাবে হারাতে থাকে, তখন তাকে যথাসম্ভব শীঘ্র রোগ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। আজকাল অবশ্য দুই মাস পরেও এই ইনজেক্‌শন শুরু করে দেওয়া হয়। ইনজেকশন দেবার আগে দেখতে হবে শিশুর গায়ে জ্বর আছে কিনা বা সম্প্রতি তার ঠাণ্ডা লেগেছে কিনা। কারণ হামের আগেও জ্বর বা ঠাণ্ডা লাগে। কিন্তু যদি কয়েকদিন যাবৎ তার নাক দিয়ে জল গড়ায় মাত্র, তবে ইনজেকশন দিতে দেরী করা উচিত নয়।

ট্রিপল অ্যান্টিজেন দেবার নানারূপ সময়সূচি আছে। সাধারণত প্রথম ইনজেক্‌শনটি শিশুর তিন মাস বয়সে দেওয়া হয়, দ্বিতীয়টি দেওয়া হয় ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে এবং তৃতীয়টি দ্বিতীয় ডোজের ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে (৪-৬ অর্থাৎ ৪ সপ্তাহের পরে এবং ৬ সপ্তাহের আগে) তবে তৃতীয় ডোজটি দিতে দেরী হলেও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই এবং এক্ষেত্রে পুরো কোর্সটাকে পুনরায় শুরু করারও দরকার নেই। বুস্টার ডোজ দেওয়া হয় তৃতীয় ডোজটির একবছর পরে। ইতিমধ্যে শিশু প্রায় ১৮ মাস বয়সী হয়। শেষ বুস্টার ডোজটি দিতে হয় একেবারে ৪-৫ বছর বয়সে। প্রথম ইনজেকশনটিতে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায় না, নির্দিষ্ট সময়ে দ্বিতীয়টি দিলে উপযুক্ত প্রতিষেধক

ক্ষমতা অর্জন করে, কিন্তু তৃতীয় ডোজ না দিলে সেই প্রতিষেধক শক্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের মধ্যবর্তী কাল নির্দিষ্ট সময়সীমা থেকে দুইমাস দেরী হলে নূতন করে আবার এই কোর্স শুরু করতে হবে। তৃতীয় ইনজেকশন নিতে দেরী হলেও ক্ষতি নেই। এমনকি একবছর বাদে তৃতীয় ডোজ নেওয়া হলেও শিশুর রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাকে উন্নত রাখবে।

অনেক চিকিৎসকের মতে ট্রিপল অ্যাণ্টিজেন কোর্স না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ এই কোর্সের অন্তর্ভূক্ত হুপিং কাশির উপাদান দেহস্থ মাংসপেশীতে প্রবল আলোড়ন (তর্কা) ঘটায়, এমন কি তাতে ব্রেণও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এইরূপ দুর্ঘটনা একান্ত বিরল। হুপিং কাশি নিজেই বাচ্চাদের একটি সাংঘাতিক রোগ—চীনে একে "একশ দিনের কাশি" বলে আখ্যা দেয়। এই রোগের কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। একমাত্র এই রোগের আক্রমণের ঠিক প্রথমদিনই যদি রোগ নির্ধারিণ করা যায়, তবেই তার প্রত্যক্ষ চিকিৎসা হতে পারে যেটা বাস্তবে সম্ভব নয়। হুপিং কাশিতে দারুণ দুর্বল তো করেই, তাছাড়াও এই রোগে শিশুর দেহ পেশীতে আলোড়ন (তর্কা) এবং ব্রেণ সংক্রান্ত ক্ষতি হতে পারে। বেশিরভাগ শিশু-চিকিৎসকের মতে সব শিশুরই হুপিং কাশি প্রতিষেধক ইনজেকশন নেওয়া উচিত। ট্রিপল অ্যাণ্টিজেন অবশ্য হুপিং কাশি একেবারেই প্রতিরোধ করে তা নয়, কিন্তু এই ইনজেকশন দেওয়া থাকলে শিশু হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হলেও তার তীব্রতা খুব কম হয়।

ইনজেকশন দেওয়ার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিশুর জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইনজেকশনের জায়গা গরম ও লাল হয়ে ফুলে ওঠে, ব্যথা হয়। চিকিৎসক উপশমের ব্যবস্থা করতে পারেন। ২৪ ঘণ্টায় জ্বর কমে যায়, জায়গাটার ফোলা কমতে কয়েক সপ্তাহ লাগে, কিন্তু তার জন্য উদ্বিগ্নতার কারণ নেই।

৪-৫ বছর বয়সে ট্রিপল অ্যাণ্টিজেন কোর্সের বুস্টার ডোজ নেবার পর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ধনুষ্টংকার রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ইনজেকশন শিশুকে দিতে হয়। ট্রিপল অ্যাণ্টিজেন কোর্সের তিনটি ইনজেকশন নেওয়ার পর শিশু যদি কোন আঘাতও পায়, ধনুষ্টংকার প্রতিরোধ ক্ষমতা ৫-১০ বছর পর্যন্ত ভালভাবে থাকবে। তথাপি শিশুর দেহের প্রতিষেধক

প্রতি বছরই টি. এ. বি. সি. টীকা নেওয়া ভাল। কলেরার প্রতিরোধ ক্ষমতা স্থায়ী হয় মাত্র কয়েক মাস।

সবশেষে বলতে হয়, শিশুর সবরকম রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের একটা রেকর্ড রাখা পিতামাতাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগে যে অনেক পিতামাতাই তাঁদের শিশুকে কবে কিভাবে কোন রোগ প্রতিরোধী টীকা বা ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে, তা ভুলে যান। শিশুর সংক্রমণ প্রতিষেধক আঁচ করা এবং বুস্টার ডোজগুলি দেওয়ার প্রকৃত সময় নির্দেশ করা চিকিৎসকের পক্ষে খুবই সহজ হয় যদি এই রেকর্ডগুলি রাখা থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিশুদের সাধারণ সমস্যা

কান্না : কোন কোন শিশু কোন কষ্ট দেয় না। খিদে পেলে তারা হয়তো অল্প কাঁদল, যেই খেতে দেওয়া হ'ল, অমনি তারা তৃপ্ত হয়ে হয় আবার ঘুমালো বা নিজে নিজে খেলা করল। বাড়িতে যে একটা শিশু আছে, তা বোঝাই যায় না—শিশুর মা সে কথাই বলবেন। এরা হল শান্ত শিশু। পেটের অসুখে বা ব্যথায় এরা কম ভোগে এবং এদের মায়েরা ভাগ্যবতী।

কিন্তু অন্য আর এক ধরনের শিশু আছে, বিশেষ করে শিশু যদি ছেলে হয়, (এবং প্রথম সন্তান) অনেক সময় কারণে অকারণে কাঁদবে, পেটের ব্যথায় কষ্ট পাবে, চঞ্চল ও খিটখিটে হবে এবং তারা ঘুমোতে বেগ দেয়। এইভাবে তারা অনভিজ্ঞ মায়েদের অশেষ উত্তেজনার ও উদ্বেগের কারণ হয়। আর যতই মা বেশী উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন হন, তত বেশি শিশুকে সামলানো তাঁর পক্ষে কঠিন হয়। দেখা যাবে যে, এইরকম অনভিজ্ঞ মা বুঝতেই পারছেন না কিভাবে ক্রন্দনরত শিশুকে শান্ত করতে হবে, অথচ একজন অভিজ্ঞ নিপুণ ব্যক্তি যেই সেই শিশুকে কোলে নিলেন, অমনি সে চুপ, যেন যাদুর ব্যাপার। শিশু যেন মায়ের উদ্বেগ ও উত্তেজনা বুঝতে পেরে নিজেরাও অস্থির ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিপুণ স্পর্শ এবং আত্মবিশ্বাস শিশুকে সহজ ও স্থির করে তোলে।

শিশুর এই অস্থিরতা তার দুই সপ্তাহ বয়স থেকে প্রকাশ পেয়ে অন্তত তিন মাস বয়স পর্যন্ত থাকে। তারপর তারা ক্রমশ স্থির হয় এবং বিশেষ কোনও কারণ ছাড়া কাঁদে না।

ক্ষুধার কান্না : খিদে পেয়ে কাঁদলে তা বোঝা এবং সুরাহা করা সহজ। পূর্ববর্তী খাবার পেটভরে না খেলে বা পরবর্তী খাবারের সময় হলে বাচচারা কাঁদে। সব অভিজ্ঞ মানুষই খিদের এই কান্না চেনেন। খিদে পেলে বাচচারা বেপরোয়া কান্না জুড়ে দিয়ে মুখ হাঁ করে এদিক ওদিকে তাকাবে, অবশেষে হাতের মুঠো মুখে ঢোকাতে

চাইবে। এই ধরনের কান্না দেখলে বোঝা যাবে যে তার খিদে পেয়েছে এবং খাওয়ার সময় না হলেও তাকে খেতে দিতে হবে, খেতে দিলেই একমাত্র সে শান্ত হবে। শিশু যদি খিদেতে নিয়মিত কাঁদে, তবে বুঝতে হবে মায়ের বুকের দুধ তার প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। তখন তাকে বোতলের দুধ বাড়তি খাওয়াতে হবে। যদি ইতিপূর্বে শিশুকে বোতলে খাওয়াতে আরম্ভ করা হয় এবং বোতলের সব দুধটাই সে নিঃশেষ করে ফেলে, তবে অবশ্যই তাকে আরও একটু দুধ খেতে দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে না খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে।

পেটের ব্যথা (কলিক) : দুই সপ্তাহ বয়স থেকে তিন মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের কান্নার সাধারণ কারণ তাদের পেটের ব্যথা। এই কারণে একে "তিন মাসের পেট ব্যথা" বলে। তিন মাসের পর শিশুদের পেটের এই ব্যথা প্রায়ই থাকে না। এই সব শিশু সকালের দিকে চমৎকার থাকে, প্রত্যেক দিন অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় তারা খিটখিটে হয়ে ওঠে এবং অবিশ্রাম কাঁদতে থাকে। এই শিশুরা সাধারণত খাওয়ার পরে এমনকি খাওয়ার সময়েও কান্না শুরু করে। তারা পা ওপরের দিকে ওঠাতে থাকবে, ব্যথায় আর্তনাদ করবে, তাদের পেট ফোলা ফোলা দেখাবে এবং কখনো কখনো পেটের গ্যাস মুক্ত করবে। পেটের ব্যথা হলে দুধ খাওয়াবার সময় শিশু প্রথম কয়েক সেকেন্ড বেশ ক্ষুধার্ত ভাবেই দুধ খাবে, তারপর খাওয়া ছেড়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পুনরায় আর্তনাদের কান্না আরম্ভ করবে। কারণ শিশুরা পেটের ব্যথা আর খিদে পাওয়ার পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে না বা হয়তো আশা করে যে দুধ চুষলে ব্যথার কিছু উপশম হবে। এই সব ব্যথায় কাতর শিশুদের কাঁধের ওপর শুইয়ে পেটের হাওয়া বের করে দিলে অথবা উপুড় করে শুইয়ে দিলে তাদের ব্যথার উপশম হয়। যদি এসব করলেও ব্যথা না কমে তবে চিকিৎসকের পরামর্শমত তাদের পেট ব্যথার জন্য ওষুধ খাওয়াতে হবে, তাতে শিশুর পেটব্যথা করবে। পেটের ব্যথায় কষ্ট ও দুর্ভোগ পোয়ালেও এই ব্যথা বেশীদিন থাকে না, সেরে যায় এবং কোন ক্ষতিও করে না—এটাই সান্ত্বনার বিষয়।

আর এক ধরনের অস্থির এবং ক্ষিপ্ত শিশু আছে। তারাও প্রতি বিকালে বা সন্ধ্যায় অবিশ্রাম কান্না জুড়ে দেয়, খিটখিটে মেজাজ

প্রকাশ করে। এরা কিন্তু পেটের ব্যথায় কাঁদে না—তারা স্রেফ অশান্ত শিশু। এদের কখনো বাইরে নিলে কান্না থামে, কখনো বা মুখে চুষিকাটি দিলেই শান্ত হয়ে যায়। চুষিকাঠি চুষতে দিলে কোন ক্ষতি হয় না যদি তা নিপল্-এর মত পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত রাখা যায়। প্রতিদিন চুষিকাঠি ফুটিয়ে পরিষ্কার ঢাকনাযুক্ত পাত্রে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হবে। বুড়ো আঙুল চোষা অপেক্ষা চুষিকাঠি চোষা ভাল অভ্যাস। চুষিকাঠি শিশু অবশ্যই ত্যাগ করবে, কিন্তু আঙুল চোষার অভ্যাস ত্যাগ করানো প্রকৃত সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। দীর্ঘকাল আঙুল চুষলে দাঁতের গঠন নষ্ট হতে পারে, চুষিকাঠিতে তা হয় না। চুষিকাঠি অভ্যাস করানো একটিমাত্র আপত্তিকর দিক হচ্ছে যে তাতে রোগ সংক্রমণ হতে পারে। কারণ বহু মা চুষিকাঠি পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন না। তাঁরা জানেন না যে দুধের বোতল অপরিষ্কার রাখলে যে ক্ষতি হয়, চুষি-কাঠি নোংরা রাখলেও একই ক্ষতি হয়। প্রথম কয়েকমাস শিশু যদি চুষিকাঠির ওপরও বুড়ো আঙুল রেখে চোষে, তবে বোঝা যাবে যে তার চুষবার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত নয়। তখন বন্ধু-বান্ধবদের উপদেশে বিচলিত না হয়ে চুষিকাঠিই চুষতে দিতে হবে। তাতে শিশুর অভ্যাস নষ্ট হবে না। শিশু যা চায়, তা হ'ল আরাম ও নিরাপত্তা। এই ক্ষুদ্র বয়সে সে এত ধূর্ত হয় না যে মাত্রাতিরিক্ত আদর দাবী করবে।

ক্লান্তি : এটাও কান্নার আর একটি সাধারণ কারণ। শিশু যদি অনেকক্ষণ জেগে থাকে, সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং অস্থির হয়ে উঠে কাঁদতে শুরু করে এবং ক্রমে ক্ষেপে যায়। তখন সে এত বেশী ক্লান্ত এবং রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে যে ঘুমোর্তেও পারে না। এ অবস্থায় শিশুকে শান্ত হতে সাহায্য করতে হবে যাতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। কাঁধে নিয়ে দোলা দিয়ে শিশুকে শান্ত করতে না পারলে তাকে চুষি-কাঠি চুষতে দেওয়া উচিত অথবা বোতলে করে জল খেতে দিতে হবে, জল চুষতে চুষতে শিশু ঘুমিয়ে পড়বে। ছোট শিশুরা চুষে সবচেয়ে বেশি আনন্দ ও আরাম পায়। কোলে করে ঘুরে বেড়িয়ে ঘুম পাড়ানোর অভ্যাস করলে শিশু সে রকম না করলে ঘুমোতে চাইবে না। সুতরাং খুব ক্ষেপে গেলে শিশুকে কিছুক্ষণের জন্য কোলে করে ঘুরে বেড়িয়ে কান্না একটু শান্ত হলে তারপর তাকে

শুইয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে পিঠ চাপড়ে তার সঙ্গে কথা বলে ঘুম-পাড়ানি গান গাইলে দেখা যাবে সে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বন্ধু, হিতৈষী আত্মীয়দের শিশুকে কোলে নিয়ে সর্বদা ঘুরে বেড়াতে না দিয়ে মাকে এ ব্যাপারে কৌশলী ও দৃঢ় হতে হবে। শিশুকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে শিশুর ক্ষেত্রে তা আনন্দদায়ক হয় না।

ভিজে যাওয়া : বারে বারে দেখতে হবে যে শিশু প্রস্রাব অথবা পায়খানা করে ভিজে রয়েছে কি না। কোন কোন শিশু ভিজে থাকলেই কঁকিয়ে ওঠে। তাদের বিছানা পাল্টে দিলেই আরাম পেয়ে শান্ত হয়ে যায়।

জনডিস্ : অনেক শিশুই জন্মের তৃতীয় দিনে ঈষৎ জনডিসে আক্রান্ত হয়। এটা দুদিনের মধ্যে বেড়ে গিয়ে পরে সেরে যায়। এতে কোন সমস্যা হয় না, এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। একে বলা হয় নবজাতকের স্বাভাবিক জনডিস্ (জনডিস্ অব্ নিউবর্ন)। এই সময়ে শিশু সাধারণত ভালই থাকে। কালো বা সবুজে পাতলা পায়খানা হয়। জন্মের প্রথম দিন থেকেই এই রোগ আরম্ভ হয়ে এক সপ্তাহের পরেও তা বিদ্যমান হলে উদ্বেগের কারণ আছে।

পেটের অসুখ : পেটের অসুখ হলে প্রথম চিহ্ন হবে অত্যধিক কান্না। শিশুর হয়তো পেটে খিঁচ ধরে, তাই সে কাঁদে। দ্বিতীয় চিহ্ন শিশুর খেতে না চাওয়া বা না পারা। কিছু শিশু আবার কাঁদতে থাকে এবং বার বার খেতে চায়। তারা খিদে ও ব্যথার পার্থক্য বুঝতে পারে না। তখন লক্ষ্য করতে হবে শিশুর পরবর্তী পায়খানা পাতলা হয় কিনা বা তাতে আম থাকে কি না। নবজাত শিশুর সে রকম পায়খানা হলেই যথা সম্ভব শীঘ্র চিকিৎসা করানো উচিত। অনেক মা-ই বুঝতে পারেন না একটি নবজাত শিশু কত দ্রুত গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে এবং দেরিতে চিকিৎসককে দেখালে তা কত মারাত্মক হতে পারে।

যা হোক্ পেটের অসুখ প্রায়ই আপনা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সব সময় শিশুর খাদ্য ও পুষ্টিগত প্রয়োজনের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, শিশুর পেটের যন্ত্রণা ও অস্বস্তিকর অবস্থা যাতে না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বহুবার জলের মত পায়খানা হতে থাকলে, সব খাদ্য বন্ধ করে শুধু আনুপাতিক আধ পাইণ্ট বা

৮ আউন্স ফোটানো জলে চা চামচের উঁচু উঁচু এক চামচ চিনি ও এক চিমটি নুন মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। প্যাকেট করা ইলেকট্রলাইট পাউডার ব্যবহারেও খুব উপকার হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে ঐ প্যাকেটের ওপর বড়দের জন্য নির্ধারিত মাপের পাউডারের অর্ধেকটা এক কাপ মত জলে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। পরিমাণ মতো ইলেকট্রলাইট মেশানো জল যতটা শিশু খেতে চায়, ততটা দিতে হবে। কারণ ক্রমাগত তরল পায়খানা করে তার দেহে জলের অভাব হয়। যখন পায়খানা একটু ভালর দিকে তখন তাকে বুকের দুধ দেওয়া যাবে এবং তার সঙ্গে ইলেকট্রলাইটযুক্ত জল বা উল্লিখিত চিনি ও নুন মেশানো জলও দিতে পারা যাবে। যদি শিশু শক্ত খাবার (সিরিয়াল) খেতে অভ্যস্ত থাকে, তবে পায়খানা আগের মত স্বাভাবিক হলেই তাকে তা খাওয়ানো চলবে, তার আগে নয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য : শিশু দিনে একবার বা দুবার এমনকি তিন বারও পায়খানা না করলে মায়েরা সন্তুষ্ট হন না। তাঁদের বোঝা উচিত সব শিশু এক রকম হয় না। অনেক শিশু এক দিন বাদে বাদে পায়খানা করে। কিন্তু সেই পায়খানা যদি স্বাভাবিক নরম হয় এবং তার সেই পায়খানা করতে যদি কষ্ট না হয়, তবে তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার, সেখানে ঘাঁটাঘাঁটির দরকার নেই। আর যদি পায়খানা খুব শক্ত হয় তবে তা নির্গত হতে শিশুর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হবে। এরকম শক্ত পায়খানা হলে শিশুর মলদ্বার কখনো কখনো ছিঁড়ে যায় এবং রক্ত পড়ে। সেক্ষেত্রে শিশুর পায়খানা নরম রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

খুব ছোট শিশুর ক্ষেত্রে দুধ খাবার সময়ের অন্তর্বর্তীকালীন ফোটানো জলে বেশী পরিমাণে চিনি, মিশ্রি বা মধু মিশিয়ে খাওয়ালেই কোষ্ঠকাঠিন্য কমে যাবে। শিশুর বয়স এক মাস হলে তাকে কমলা, মৌসম্বি বা তার অভাবে কাপড়ে ছেঁকে টম্যাটোর রস মিষ্টি মিশিয়ে খাওয়ানো কোষ্ঠকাঠিন্যের পক্ষে উপকারী। তিন মাস বয়সের শিশুকে আপেল সিদ্ধ করে চিনি দিয়ে পেস্ট করে খাওয়ালেও ভাল ফল হয়। এর বেশী বয়সের শিশুকে সম্ভবত সবজীজাতীয় তরিতরকারী খেতে দিলে পায়খানা নরম থাকে। পাকা কলায় পায়খানা শক্ত হয়ে যেতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ

ছাড়া শিশুকে ওষুধ খাওয়াতে আরম্ভ করা উচিত নয়। উল্লিলিত সহজ উপায়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর না হলে চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে শিশুর অভ্যন্তরীণ কোনও সমস্যা আছে কি না। এ ব্যাপারে শিশুকে যতটা সম্ভব কম ওষুধ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। হামেশা ওষুধ ব্যবহারে শিশুর ওষুধে অভ্যাস দাঁড়িয়ে যাবে। অবশ্য কখনও কখনও তাকে পায়খানা নরমের ওষুধ (ল্যাক্সেটিভ) দিতে হবে বৈকি। আমাদের ঠাকুরমা-দিদিমায়েরা মলদ্বারে পানের বোঁটা দিয়ে দিব্যি বাচ্চাকে পায়খানা করাতেন। এটা ক্ষতিকারক নয় যদি তা মাঝে মাঝে করানো হয়। অনেক মা আছেন যাঁরা নিয়মিত এই প্রথা অবলম্বন করেন। ফলে শিশু আর পানের বোঁটা না দিলে পায়খানা করে না। পানের বোঁটা প্রত্যেকের বাড়িতে না-ও থাকতে পারে। এর বদলে যে কোন গায়েমাখা কোমল সাবানের ছোট টুকরোকে কোণাকুণি কেটে একটু ভিজিয়ে রেখে পিচ্ছিল করে নিয়ে মলদ্বারে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। তারপর শিশুর পাছা দুটো এক করে একটু সময় ধরে রাখতে হবে যাতে সাবান-টুকরো তক্ষুনি বেরিয়ে না আসে। অল্প সময়ের মধ্যেই শিশু পায়খানা করবে। কিন্তু এটাও নিয়মিত করা ঠিক নয়। প্রয়োজন বিশেষেই প্রযোজ্য।

বমি করা : অধিকাংশ শিশু দুধ খাবার পরেই বমি করে দেয়। সাধারণত সেই বমির পরিমাণ খুব কম হলেও অনেক সময় আশংকা হয় সবটাই বুঝি বমি করে দিল। মায়েরা এ নিয়ে অভিযোগ করেন যে তাঁদের বাচ্চা যা খায়, তাই বমি করে ফেলে। অথচ তাঁদের শিশুর স্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। সুতরাং বমি করলেও খাদ্য থেকে যা পাবার তা সে নিশ্চয়ই পেয়ে যায়। দুধ খাবার পর বমি করলেই এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে দুধ বাচ্চার উপযোগী হচ্ছে না। বাচ্চাদের বমি করাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যদিও কোন কোন শিশু অন্যান্যদের তুলনায় একটু বেশি বমি করতে পারে। বমি করার প্রবণতা বেশী থাকলে দুধ খাওয়াবার পরই শিশুকে উঁচু করে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হবে যাতে সে দুধ খাবার সময় যে হাওয়াটা তার পেটে যায় সেটা বের করে দিতে পারে এবং সোজা হবার দরুণ খাওয়া দুধটা পেটে তাড়াতাড়ি নেমে যেতে পারে।

বড়দের পেটের ওপরের অংশ যতটা সহজে সংকুচিত হয় শিশুদের ততটা হয় না। ফলে দুধ খাবার পর শুইয়ে দিলে তার কিছুটা বেরিয়ে আসার অবকাশ থাকে। সেইজন্য দুধ খাওয়াবার পর তাকে পাশ করে শোয়ান বেশী নিরাপদ। কারণ শিশু দুধ বার করলে তা সোজা বিছানায় পড়বে। চিত করে শোয়ালে নাক মুখ অবরুদ্ধ হতে পারে। এসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও কোন কোন শিশু বিশেষত চঞ্চল ও খিটখিটে শিশুরা খাবার পরই দুধের অনেকটা অংশ বমি করে ফেলে। চিকিৎসকের পরামর্শ মত এই শিশুদের জন্য ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

অনেকটা দুধ বমি করলে মায়েরা পুনরায় খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে যান। তা না করে যতক্ষণ না শিশুর খিদে পায়, ততক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত। কারণ পরপর দুবার খাওয়াতে শিশুকে জোর করতে হতে পারে, ফলে তার আবার বমি করার প্রবণতা হতে পারে। বমি করা দুধে দইয়ের ভাব দেখে অনেক মা ভাবেন তাঁদের শিশুর অম্বল হয়েছে। এটা ঠিক নয়। প্রত্যেকের পেটে কিছু মাত্রায় অম্লভাব থাকে, তাতেই দুধ দইতে পরিণত হয় এবং এটা হজমেরই একটা প্রক্রিয়া। বমি করা দুধ ছানা কাটা হলেও তার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই।

বমি করা যদি প্রকৃতই সমস্যার হয় এবং শিশুর যদি স্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধি না পায়, তবে চিকিৎসককে দেখিয়ে ওষুধ ব্যবহার করা উচিত। যে শিশু আগে কখনও বমি করে না, সে যদি হঠাৎ বমি করতে আরম্ভ করে, তা হলে চিকিৎসা করানো কর্তব্য। কারণ হঠাৎ বমি করা রোগের লক্ষণ হতে পারে।

হিক্কা: শিশুদের হিক্কা তোলাই স্বাভাবিক, এতে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু বেশী হিক্কা তুলে শিশু অস্বস্তি বোধ করলে এবং ঘুমোতে না পারলে তাকে একটু জল খাওয়ালেই তার হিক্কা থেমে যাবে।

শিশুর দুধের বোঁটা স্ফীতি: কিছু শিশুর—কি ছেলে কি মেয়ে, জন্মের কয়েকদিন পরে তাদের দুধের বোঁটা স্ফীত হয়। অনেক সময় বোঁটায় দুধও আসে। জরায়ুতে থাকাকালীন মায়ের হর্মন শিশুর রক্তে মেশার দরুনই এটা হয়। মায়ের হর্মনের সক্রিয়তা কমে গেলে

শিশুর বুকে সঞ্চিত হর্মনও মিলিয়ে যায়। কখনও এটা হতে সপ্তাহ দুই লাগে। কিন্তু কখনও মালিশ করে বা দুধ গেলে দিয়ে শিশুর বুকে সঞ্চিত হর্মন কমাতে নেই। তাতে ক্ষতিসাধন বা রোগসংক্রমণ হতে পারে।

স্ত্রী যোনি থেকে রক্ত নির্গমন : এটা প্রায়ই দেখা যায় মেয়ে নবজাতকের ক্ষেত্রে। মায়ের হর্মন শিশুর দেহে সঞ্চালনের ফলে এটা হয়। এটা কোনরকম ক্ষতিকর নয়। এর জন্য কোন কিছু করবার দরকার নেই। দুই বা তিন দিনের মধ্যেই এই রক্ত নির্গমন বন্ধ হয়ে যায়।

জন্মদাগ এবং চামড়ায় গোটা ওঠা : মঙ্গোলিয়ান দাগ—এই দাগের নামের কোন তাৎপর্য নেই। আমাদের দেশে অধিকাংশ শিশুই জন্মদাগ নিয়ে জন্মায়। সেগুলো কালচে বা নীলচে দাগ, প্রায়ই বেশ বড় আকারে সাধারণত পাছায় বা পিঠে হয়। কালশিটের মত এই দাগ বছর খানেক পরে অবশ্যই মুছে যায়। এর জন্য কোন চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন নেই।

মাসীপিসী : জন্মের প্রথম কি দ্বিতীয় সপ্তাহে শিশুর গায়ে সাদা মুখ নিয়ে লাল লাল গোটা ওঠে। দিনে দিনে এর রূপ পরিবর্তিত হয় এবং কয়েকদিন পর একেবারে চলে যায়। অভিজ্ঞ মায়েরা এগুলো চিনতে পারেন এবং একে বলেন "মাসীপিসী" হয়েছে। তাঁরা জানেন যে মাসীপিসী হয় এবং হলে দুশ্চিন্তা করেন না যদিও কখনো কখনো মাসীপিসীর গোটাগুলো বেশ বড় হয়। অনুরূপ ভাবে শিশুর জন্মের কয়েকদিন পর তার চোখের পাতায় ও কপালে লাল লাল গোটা ওঠে।

জন্মদাগ বা জড়ুল চিহ্ন : এই দাগ আকারে বেশ বড়, সাধারণতঃ লাল রঙের হয় এবং সুনির্দিষ্ট গণ্ডী দ্বারা চিহ্নিত থাকে। তবে পরে এর রঙের উজ্জ্বলতা কমে যায়। কোন কোন জন্মদাগ আবার উঁচু আঁচিলের মত হয় এবং এর মধ্যে খুব সরু সরু রক্তের শিরা থাকে। এগুলো জন্মের সময় আকারে বড় হয় এবং বছর তিনেকের পর আবার ধীরে ধীরে মিলিয়েও যেতে পারে। সুতরাং তিন বছর পর্যন্ত এর জন্য চিকিৎসা না করিয়ে নিজে থেকে তা মিলিয়ে যায় কিনা, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

নাভিস্ফীতি (আম্‌বিলিক্যাল হার্নিয়া) : কোন কোন শিশুর নাভিদেশ শুকিয়ে যাবার পর নাভিমুখের নীচের মাংসপেশীতে ফাঁকের সৃষ্টি হয়। শিশু কাঁদলে বা কোঁত দিলে নাভি বেলুনের মত ফুলে ওঠে। প্রথম কয়েক মাসে এটা ক্রমশ বাড়তে পারে এবং ভীতিপ্রদ হতে পারে। কিন্তু এতে সাধারণত কোনও সমস্যার সৃষ্টি হয় না। শিশু হামা দিতে বা দাঁড়াতে শিখলে তার পেটের মাংস-পেশী শক্ত হতে থাকে। ক্রমে ফোলা নাভিমুখও সঙ্কুচিত হতে হতে শেষে স্বাভাবিক ভাবে বুজে যায়। এই ভাবে বেশ বড় ফোলা নাভিও সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়। ফোলা নাভির জন্য ফিতে বেঁধে রাখলে বা ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে কোনও ফল হয় না।

কুঁচকি স্ফীতি (ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া) : অনেক নবজাত পুং শিশুর কুঁচকি স্ফীত হয়ে নীচের দিকে ঝুলে পড়তে দেখা যায়। নাভি স্ফীতির তুলনায় কুঁচকি স্ফীতি কম দেখা যায়। এতে নবজাতকের কোনও অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। ক্রমে এই স্ফীতি হ্রাস পেয়ে বিলুপ্ত হয়। তবুও চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা ভাল।

অণ্ডকোষ বৃদ্ধি : সাধারণত অণ্ডকোষ সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকে। কখনো কখনো নবজাত শিশুর অণ্ডকোষের চারপাশের ওই তরল পদার্থ স্বাভাবিকের তুলনার বেশি থাকে। তখন একটি কোষ অপরটি থেকে স্ফীত দেখায়। স্বাভাবিক গতিতেই এই তরল পদার্থ হ্রাস পেয়ে যায় এবং কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। তবে চিকিৎসককে দেখিয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে এটা হার্নিয়া রোগ নয়। হার্নিয়া হলে চিকিৎসার দরকার হয়।

ফাইমোসিস (Fymosis) : অধিকাংশ নবজাত পুং শিশুর জননেন্দ্রিয়ের ওপরের চামড়া বেশ আঁট থাকে যার ফলে সেই চামড়া জননেন্দ্রিয়ের ওপর দিকে টেনে তোলা যায় না। যদি শিশু স্বাভাবিক ভাবে প্রস্রাব করতে পারে (তার অর্থ সহজ ধারায় প্রস্রাব নির্গত হতে পারে) এবং ফোঁটায় ফোঁটায় বা থেকে থেকে সরু ধারায় প্রস্রাব না হয়, তবে করার কিছু নেই। ছেলে বা মেয়ে সব শিশুরই প্রস্রাব করতে বেগ দিতে হয়। কারণ তাদের প্রস্রাবের থলি পেটের উপরের দিকে থাকার ফলে প্রস্রাব করার সময় বেগ প্রয়োগ করতে হয়। অনেক শিশু প্রস্রাব করার আগে কেঁদে ওঠে এবং অস্থিরতা

প্রকাশ করে। প্রস্রাব করা হয়ে গেলে যেন আরাম বোধ করে শান্ত হয়ে যায়। তাদের প্রস্রাবের থলিটি মূত্রে পরিপূর্ণ হবার জন্য এই অস্বস্তি হয়। পুং জননেন্দ্রিয়ের চামড়ার মুখ নিজে থেকে ক্রমশ বেড়ে যায়। যদি শিশুর প্রস্রাব করতে বেশ অসুবিধা ও কষ্ট হয় এবং জননেন্দ্রিয়ের উপরিস্থিত চামড়ার মুখ সুঁচের মুখের মতন সরু হয়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত সেই সরু মুখের চারিধারে একটু কেটে দিতে হবে। কিন্তু তা করতে হলে শৈশবের প্রথমভাগে করাই ভাল। কারণ বড় ছেলের পক্ষে এটা ভীতিকর ব্যাপার হবে, অপরদিকে ক্ষতস্থানে ড্রেস করাও সমস্যার হবে। পূর্বে ধারণা ছিল খুব সরু পুং জননেন্দ্রিয়ের মুখের চামড়াকে দৈনিক ওপরের দিকে টেনে ওঠানোর চেষ্টা করলে মুখ ক্রমশ বড় হয়ে যায় এবং অনেক বৃদ্ধা মা তা করে থাকেন। এ কাজ দারুণ খারাপ। ক্রমাগত ওপরে তোলার চেষ্টা করলে শিশুর কোমল চামড়ায় আঘাত পেতে পারে, উপরন্তু জীবাণু সংক্রমণেরও সম্ভাবনা থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে অনেকক্ষেত্রে শিশুর জননেন্দ্রিয়ের চামড়া আরও বেশী আঁট হয়ে যায়। ক্রমাগত জোর করে চামড়া ওপরে তোলার ফলে তা ছিঁড়ে যায় এবং ছেঁড়া জুড়ে গিয়ে আগের থেকে বেশী আঁট হয়ে পড়ে। সুতরাং আপনার শিশুর পুং জননেন্দ্রিয় যদি প্রকৃতই আঁট আছে বলে মনে হয়, এবং যদি সে সহজভাবে প্রস্রাব করতে পারে তবে ছয় মাস বয়স হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিত হবে। প্রস্রাব করতে কখনও যদি অসুবিধা হয় তখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

মাথার ফুসকুড়ি (ক্র্যাডল ক্যাপ) : ৪-৮ সপ্তাহ বয়সে অনেক শিশুর মাথায় লাল ফুসকুড়িতে ভরে যায়। ইংরাজীতে একে বলে ক্র্যাডল ক্যাপ। দ্রুত চিকিৎসা না করলে এগুলি খুব শীঘ্র সমস্ত মাথায়, কপালে, ভুরুতে, চোখের পাতায়, থুতনিতে, হাতের তালুতে, কুঁচকিতে, কানের পিছনে এবং এভাবে দেহের সব অংশে ছড়িয়ে পড়বে। এই ফুসকুড়ি প্রথমে মাথার নরম জায়গায় ওঠে। তখনই এর চিকিৎসা সুরু করা উচিত। মাথায় তেল দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে। স্যাভলন জাতীয় লোশন সহকারে প্রতিদিন বা একদিন অন্তর শ্যাম্পু করতে হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে ফুসকুড়ি কমে না গেলে চিকিৎসক দেখিয়ে তাঁর নির্দেশমত মলম লাগাতে হবে। চিকিৎসা

করালে এই রোগ তাড়াতাড়ি সেরে গেলেও আপনাকে মলম লাগানো চালিয়ে যেতে হবে। কারণ তৈলাক্ত আঁশের মত এই ফুসকুড়ি ৩ থেকে ৪ মাস পর্যন্ত বার বার হতে চায়। যদিও এই র‍্যাস্ (গুটী) শিশুর শরীরে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা দেয় না তাহলেও আরো যাতে ছড়িয়ে না পড়ে এবং সংক্রমিত না হয় তার জন্য ডাক্তারের পরামর্শমত মলম লাগাবেন। প্রাথমিক অবস্থায় যদি আপনি এর যথাযথ চিকিৎসায় অবহেলা করেন তাহলে শিশুর কপাল, ভ্রূ, কানের পিছনে, বগলে এবং কুঁচকিতে লাল লাল গোটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ন্যাপকিন্ র‍্যাস্ : সৌভাগ্যবশত আমাদের ভারতবর্ষে এই রোগ কম হয়। কারণ ভারতীয় মায়েরা প্লাস্টিকের ন্যাপকিন খুব কম ব্যবহার করেন। শিশুর শরীরের এই অংশে যে ফুসকুড়ি ওঠে তার কারণ শিশুর মলের জীবাণুর (ব্যাকটিরিয়ার) উপস্থিতি। শিশুর পরিহিত গরম ভিজে ন্যাপকিনে থাকা ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে তার প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত অ্যামোনিয়ার মিলনে ন্যাপকিন পরিহিত অংশে লাল লাল খুব জ্বালাদায়ক গোটা হয়। স্বভাবতই প্লাস্টিকে তৈরী ঢাকা ন্যাপকিনে শিশু বেশি সময় থাকলে সেই স্থান গরম হয়ে ওঠে এবং ব্যাকটিরিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই গোটা প্রতিরোধের সব চেয়ে ভাল উপায় বেশীসময় প্রস্রাবের মধ্যে ফেলে না রাখা এবং যথাসম্ভব প্লাস্টিকের ন্যাপকিন ব্যবহার না করে বিশোষক ন্যাপকিন (কাপড়ের ন্যাপকিন) ব্যবহার করা। যদি দেখেন শিশুর গায়ে ন্যাপকিন র‍্যাস্ বেরিয়েছে তাহলে আপনাকে শিশুর ব্যবহৃত ন্যাপকিন যত্ন সহকারে ধুতে হবে। খুবই ভালো হয় যদি এগুলি গরম জলে ফুটিয়ে নেওয়া হয়। কারণ তাহলে এগুলি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হবে। রোদ্রে শুকালেও এই ফল পাওয়া যায়। ন্যাপকিন, কাঁথা কাপড়—যাতে শিশু প্রস্রাব করে, সেগুলো ধোবার জলের মধ্যে কিছুটা ভিনেগার দিলেও ব্যাকটিরিয়া দূর হয়।

ব্যাকটিরিয়া বৃদ্ধির কারণ দূর করলেই ফুসকুড়ি হতে পারবে না। সুতরাং শিশুর দেহের এই অংশ খোলা হাওয়ায় রাখলেই সাধারণত চলে। তবে কখন কখন মোলায়েম মলমের প্রয়োজন হতে পারে। ৩।৪ মাস পরে এই ন্যাপকিন র‍্যাস্ থাকে না।

থ্রাশ বা মুখের ছত্রাক : যদিও শিশুর মুখের থ্রাশ নিয়ে এর আগে (যেখানে শিশুর মুখের যত্ন নেওয়ার কথা বলেছি) বিশ্লেষণ করেছি, তবুও শিশুর মুখের থ্রাশ এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে এখানে আমি তার আরও আলোচনা করতে চাই। এ হল ছত্রাক জাতীয় এক প্রকার জীবাণুর আক্রমণ। শিশুরা প্রায়ই জন্মগ্রহণের সময় মায়ের যোনিপথে এই রোগের দ্বারা সংক্রামিত হয়। সাধারণত শিশুর জিহ্বায়, গালের এবং ঠোঁটের ভিতরের দিকে ছোট ছোট দই টুকরোর মত প্রলেপ পড়ে। এর দ্রুত চিকিৎসা করানো উচিত, নতুবা সারা মুখের ভিতর সংক্রমণের এই ক্ষত ছড়িয়ে পড়ে শিশুর মুখে এমন যন্ত্রণা হবে যে সে দুধ চুষে খেতে পারবে না। গলায়, কুঁচকি প্রভৃতি স্থল, বিশেষত শিশুর দেহের কোন স্থানে যদি আগে থেকেই একজিমা জাতীয় চর্মরোগ থাকে, তবে সেই সব স্থানে মুখের ঐ ক্ষত অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং মুখের ক্ষত চোখে পড়া মাত্র তার চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। শিশুর মুখের ঐ ক্ষত দইয়ের মত দেখতে এবং এই ক্ষত তুলে ফেলা যায় না। যদি জোর করে তোলার চেষ্টা করেন তবে ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাতও হতে পারে। প্রথম ক্ষত দেখা দিলেই চিকিৎসা করালে তা খুব কার্যকরী হয় এবং তাড়াতাড়ি সেরে যায়। এক পারসেন্ট জেনশিয়ান ভায়োলেট (যা যে কোন ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়) তা প্রত্যেকবার দুধ খাওয়াবার পরে লাগাতে হবে। এমন কি প্রত্যেক-বার খাওয়াবার পর এক ফোঁটা ঐ ওষুধও যদি শিশুর জিহ্বায় দেওয়া যায় তা শিশু জিভ নাড়াবার ফলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে কাজ করবে। আপনাকে এটা বারবার প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে পুনরায় ঐ ক্ষত শিশুর মুখে হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। শিশু যদি বুকের দুধ খায় তবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার নিপলের যত্ন নিতে হবে। প্রত্যেকবার দুধ খাওয়াবার আগে ও পরে আপনার নিপল ভাল ভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নেবেন। আর যদি শিশু বোতলের দুধ খায়, বোতলের নিপলও প্রত্যেকবার খাওয়ার আগে ফুটিয়ে নিতে হবে।

ঘামাচি : আমাদের দেশের গরম ও ভ্যাপসা আবহাওয়ায় শিশুরা প্রায়ই ঘামাচিতে কষ্ট পায়। লাল লাল গোটার মত এই ঘামাচি বিশেষত শিশুর ঘাড়ে, গলায় পিঠে বুকে ওঠে। ঘামাচি

হয় বেশি ঘামিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্ল্যান্ডগুলি অবরুদ্ধ হবার ফলে। সুতরাং শিশুকে যতটা সম্ভব ঠাণ্ডার মধ্যে রাখা উচিত। নাইলনের পোশাক পরানো এবং প্রত্যক্ষ রবার ও প্লাস্টিকের সীটের উপর শোয়ানো যথা-সম্ভব এড়িয়ে যাবেন। বারে বারে শিশুর গা মুছিয়ে বেবীপাউডার গায়ে দিলে ঘাম শুষে নিতে সাহায্য করবে। শিশুর দেহের যেখানে ঘামাচি হয়েছে, সেখানে ১ কাপ জলে চা চামচের সোডা-বাই কার্বনেট গুলে তাতে তুলো ভিজিয়ে নিঙড়িয়ে নিয়ে মুছিয়ে দিলে ঘামাচির ব্যাপারে খুব উপকার হয়।

একজিমা : চরম বেদনাদায়ক এই রোগ সাধারণত হাঁপানি, আরটিকোরিয়া, হাঁচি প্রভৃতি অ্যালারজিজাত রোগাক্রান্ত পরিবারের শিশুদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। মোটা শিশুদের মধ্যে একজিমা বেশী দেখা যায়। একজিমা, অ্যালারজিরই একটি প্রতিক্রিয়া এবং এই রোগ সেই সব ব্যক্তি বা শিশুরই হয়, যাদের অ্যালারজির প্রবণতা আছে। গরুর দুধ এবং পরবর্তীকালে ডিম, গমজাত খাদ্য—যা শিশু গ্রহণ করে, তার যে কোন একটিতে শিশুর অ্যালারজি হতে পারে। এছাড়াও উল বা নাইলনেও অ্যালারজি হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে এলেও গোটা গোটা অ্যালারজি হতে দেখা যায়।

একজিমা হলে শিশুকে চিকিৎসক দেখান উচিত। তিনি একজিমার গুটি দেখে তার চিকিৎসা নির্ধারণ করবেন। এই রোগ সাধারণতঃ শিশুর তিন মাস বয়সের পর শুকনো রুক্ষ আঁশযুক্ত লাল গোটা নিয়ে কপালে বা থুতুনিতে প্রথম দেখা দেয়। পরে এটা দেহের যে কোন স্থানে ছড়াতে পারে। তিন বছর বয়সের পর একজিমা শরীরের স্থান বিশেষ—যেমন মুখে, হাত ও পায়ের সন্ধি-স্থলে (কনুই-এর সামনের দিকে ও হাঁটুর পিছনে) সীমিত থাকে। শিশুর পক্ষে এ বড় কষ্টদায়ক রোগ। কারণ একজিমায় আক্রান্ত স্থানে বিশ্রীভাবে চুলকায়, আর চুলকানির উপশমের জন্য ওষুধ লাগানো দরকার হয়। অনেক সময় শিশুর কনুই কাঠের চাটাই (স্প্লিণ্ট্) দিয়ে বেঁধে রাখতে হয় যাতে সে একজিমার স্থান চুলকাতে না পারে। কেন না বেশি চুলকালে ক্ষত আরও বেড়ে যায়। একজিমার চিকিৎসা চিকিৎসক মহাশয় করলেও আপনারও

কিছু কিছু ব্যাপার এ সম্পর্কে বোঝা প্রয়োজন। প্রথমত, একজিমা অন্যান্য সংক্রমণঘটিত রোগের মত নয় যা একবার চিকিৎসিত হলে চিরকালের মত সেরে যায়। এটা একটা আজন্ম প্রবণতা। সুতরাং যে সব পদ্ধতির প্রয়োগে একজিমার নিয়ন্ত্রণ হয়, সে সব পদ্ধতির ব্যবহার চালিয়ে যেতে হবে কারণ ঘুরে ঘুরে এই রোগ মাথা তোলে। এর জন্য উদ্বিগ্ন বা হতাশ হওয়ার কারণ নেই। এটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে একজিমায় আক্রান্ত অর্ধেক শিশু দুই বৎসর বয়সের পর সম্পূর্ণ সেরে যায় এবং অনেকের সম্পূর্ণ সেরে না গেলেও অনেকটা কমে যায়।

যে অ্যালারজি থেকে একজিমা হয়, সেই অ্যালারজির কারণ অনুধাবন করতে পারলেই সুবিধা হয়। শিশু যদি গরুর দুধ খেতে অভ্যস্ত থাকে, তবে তা বন্ধ করে গুঁড়ো দুধ খাইয়ে দেখতে হবে। গুঁড়ো দুধে গরুর দুধ থাকলেও তার প্রোটীন পদার্থ বাষ্পীভবনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। ছাগলের দুধও খাইয়ে দেখা যেতে পারে। কোনও কোনও শিশুকে সয়াবীনের দুধ খাওয়াতে হতে পারে। যদি শিশু বিভিন্ন ধরনের খাদ্যগ্রহণ করে থাকে, তবে অবশ্য খাদ্যের অ্যালারজি নিরূপণ করা আরও কষ্টসাধ্য। তবু প্রতিটি খাদ্য দুই সপ্তাহ বাদ দিয়ে খাইয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। এই সময় জ্বালাদায়ক সব বস্তু যেমন, সাবান, উল এবং নাইলন একেবারেই বর্জন করতে হবে। শিশুর ওজন যদি স্বাভাবিকের চাইতে বেশি হয়, তাকে চিনি ও শর্করাজাতীয় খাদ্য খাওয়ানো যথাসম্ভব কমিয়ে দিতে হবে।

আর একটা উদ্বেগজনক ব্যাপার এই যে, শৈশবে যে শিশুর বার বার একজিমা হয়, পরবর্তীকালে তার হাঁপানী হবার সম্ভাবনা থাকে।

জ্বর ও মাংসপেশীতে খিঁচুনি বা তর্কা :

এটাও একটি ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করে এবং শিশুর ৬ মাস থেকে ৩ বৎসর বয়সে ঘটতে পারে। সাধারণত পরিবারের অন্যান্য কেউ শৈশবে এই রোগে আক্রান্ত হলে সেই পরিবারের শিশুর এই রোগে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। পেশীর এই খিঁচুনির অর্থ এই নয় যে শিশুর কোন দোষ আছে—বিশেষ কোন অবস্থা বা কারণে আমাদের মধ্যেও এই রকম পেশীতে খিঁচুনি হতে পারে। জ্বরের

ফলে খিঁচুনি ঠিক কি কারণে হয়, তা জানা যায় নি। তবে মনে হয় জ্বরের প্রথম আক্রমণ শিশুর অপরিণত মস্তিষ্কের কোষগুলিতে অত্যধিক ক্ষরণ ঘটায় যার জন্য পেশীতে খিঁচুনি হয়। তাতে জ্বরের ডিগ্রীর তারতম্যে কোন যোগাযোগ নেই। দেখা যায় জ্বরের শুরুতেই কোন শিশুর খিঁচুনি হল, অথচ জ্বর যখন খুব বেড়ে গেল তখন সেই খিঁচুনি থাকে না। যদিও যে কোন স্বাভাবিক শিশুর খিঁচুনি হতে পারে, তবু পিতা ও মাতার এ ব্যাপারে তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। কারণ যদি চিকিৎসা না করা হয় তাহলে শিশুর দীর্ঘস্থায়ী খিঁচুনি ভবিষ্যতে ক্ষতিকারক হতে পারে।

প্রথমেই যেটা প্রয়োজন, তা হল জ্বরের তাপকে নামিয়ে ফেলা। এর সব চেয়ে দ্রুত এবং কার্যকরী উপায় শিশুকে স্পঞ্জ করা—শুধু মাথায় নয় শিশুর সমস্ত দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পঞ্জ করে দেওয়া। দেহের যতটা অংশ ঠাণ্ডা হবে, স্পঞ্জ করা ততই কার্যকরী হবে। মাথার তালুতে বরফ লাগানোয় কোন ফল হয় না। সামান্য গরম জলে স্পঞ্জ করলে বেশী ভাল হয়। কারণ ঠাণ্ডা জল এবং বরফ জল চামড়ার সঙ্গে রক্তের শিরাগুলিকে চেপে সংকুচিত করে ফেলবে। তারই ফলে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চামড়ায় রক্ত সঞ্চালন হবে না। গরম জলে রক্তবাহী শিরা-উপশিরা প্রসারিত হয়ে ভালভাবে রক্ত সঞ্চালনও হবে, এবং স্পঞ্জের ফলে দেহ ঠাণ্ডা হবে। সামান্য গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে শিশুর দেহ ও হাত-পা বার বার—যতক্ষণ না জ্বর কমে, স্পঞ্জ করে যেতে হবে। দেহের ভিজে ভাব শুকাবেন না। কারণ স্পঞ্জের ফলে চামড়ার আর্দ্রতা বাষ্পীভূত হয়ে দেহের তাপ কমিয়ে দেবে। শিশুর ঠাণ্ডা লাগবে ভেবে উদ্বিগ্ন হবেন না কারণ তার ঠাণ্ডা লাগবে না। বরঞ্চ যে কোনও উপায়ে জ্বরের তাপ নামিয়ে ফেলা বেশী জরুরী। একই সঙ্গে জ্বরের ওষুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। কেননা স্পঞ্জের জন্য সাময়িকভাবে জ্বর কমলেও তা আবার বাড়তে পারে। জ্বরের সময় একবার যে শিশুর দেহের পেশীতে খিঁচুনি হয়েছে পরবর্তীকালেও জ্বর হলে তার খিঁচুনি হবার খুবই সম্ভাবনা—এর জন্য আপনাকে তৈরী থাকতে হবে। চিকিৎসক শিশুকে দেখে বিবেচনা করতে পারবেন যে তার খিঁচুনি অন্য কোন কারণে সংঘটিত হচ্ছে কি না। তিনি সেইরকম ব্যবস্থা

নেবেন এবং জ্বরের তাপ ও পেশীর খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করবেন। বাড়িতে সব সময় জ্বর নিয়ন্ত্রণ রাখার ওষুধ হাতের কাছে রাখবেন। ৩।৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর জ্বর হলেই মাতা-পিতার সতর্ক থাকা কর্তব্য। চিকিৎসকের আগমনের অপেক্ষায় না থেকে শিশুর জ্বরভাব দেখলেই জ্বর নিয়ন্ত্রণের ওষুধ খাইয়ে দেওয়া প্রয়োজন যাতে জ্বরের আক্রমণে পুনরায় তার খিঁচুনি না ওঠে। অবশ্য শুধু এই খিঁচুনি বিশেষ ক্ষতিকারক নয় এবং অধিকাংশ শিশুর জ্বরের সময়কার খিঁচুনি ৩।৫ বছরের পর আর থাকে না। তথাপি এই সময়কার খিঁচুনিকে নিয়ন্ত্রণ না করলে তা তীব্র খিঁচুনির আকার ধারণ করে মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধন করতে পারে। সুতরাং জ্বর ও খিঁচুনির ওষুধ সর্বদা বাড়িতে, শিশুর নাগালের বাইরে নিরাপদ স্থানে রাখবেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে পরিবারে কারো মৃগী রোগ থাকলে সেই পরিবারের শিশুর যদি খিঁচুনি থাকে, তবে বড় হয়ে শিশু মৃগী রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

অপুষ্ট শিশু : নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মালে শিশুদের মধ্যে নানা সমস্যা দেখা দেয়। ধরা যাক, একটি শিশু নির্দিষ্ট সময়ের চার সপ্তাহ আগে ভূমিষ্ঠ হল। স্বাভাবিক কারণে স্বাভাবিক শিশুর চেয়ে সে আকারে ছোট হবে। এক্ষেত্রেও কিন্তু লালন-পালন নিজেদের দ্বারা সম্ভব। যদি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেখাশোনা করা যায় তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের তিন মাস আগে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুরও বেঁচে যাওয়া সম্ভব। অবশ্য তাদের জন্য চাই অভিজ্ঞজনের নির্দেশিত যত্ন। এদের ওজন যে কেবল মাত্র ১ বা ২ কিলোগ্রাম হবে তাই নয়, এরা সবদিক থেকেই হবে অপুষ্ট। এদের শ্বাস-প্রশ্বাসের বা দেহের তাপ বজায় রাখাটাও অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে, এদের কিডনী বা লিভার অপুষ্ট হওয়ার জন্যে এদের দিতে হবে সঠিক মাত্রায় তরল ও পুষ্টিকর খাদ্য। স্বাভাবিক শিশুর জন্মের প্রথম সপ্তাহে যে কামলা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক কঠিন কামলা রোগ হতে পারে। এরা টেনে বা গিলে খেতে না পারলে এদের পাকস্থলী পর্যন্ত নল চালিয়ে তার মধ্যে দিয়ে অতি সাবধানে অত্যন্ত পরিচিত খাদ্য দিতে হবে। এসব করতে চাই কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য। এই সব অপুষ্ট শিশুর শরীরে সহজেই সংক্রমণ বাসা বাঁধতে পারে কেন না

সংক্রমণের প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপযুক্ততা তারা তখনও পায় নি। এরকম অবস্থায় বাবা মার চিন্তার অবধি থাকে না। প্রথম দিকের কয়েক সপ্তাহ যদি ভালোয় ভালোয় কেটে যায় তাহলে আর চিন্তার কারণ থাকে না, কেননা তারপর এরা ঠিক স্বাভাবিক শিশুর মতই বেড়ে উঠতে থাকে, নির্দিষ্ট সময়ের দুমাস আগে জন্মানো শিশুর পক্ষে সাধারণ শিশুর থেকে সব কিছু দেরিতে শেখার ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হলেও বাস্তবে দেখা গেছে তারা অন্যদের থেকে একটু তাড়াতাড়িই সব কিছু শিখে ফেলছে। দেখা গেছে আগে জন্মানো শিশু ১২ মাসের মধ্যেই স্বাভাবিক সময়ে জন্মানো শিশুর এক বছরে শেখার জিনিসগুলো শিখে ফেলেছে।

অপুষ্ট শিশু: নির্দিষ্ট সময়ের ৪।৬ সপ্তাহ আগে জন্মানো শিশুর দেখাশোনা মা বাবার পক্ষে করা সম্ভব। এই সময়ে জন্মানো শিশুরা স্বাভাবিক সময়ে জন্মানো শিশুদের মত ভালভাবে না হলেও মোটামুটিভাবে টেনে খেতে পারে। এই শিশুদের খাওয়ানোর ব্যাপারটাই হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা। সাধারণ শিশুর চেয়ে এইসব শিশুর বেশি দরকার মায়ের দুধ, কারণ তাদের পক্ষে অপুষ্ট কিডনীর ওপর বেশি ভার চাপানো সম্ভব হয় না। তাছাড়া, আগেই বলেছি এই সব শিশুর যে সব সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে তার প্রতি-রোধের অনেক উপাদানই উপস্থিত রয়েছে মায়ের দুধের মধ্যে। সুতরাং এই শিশুর জন্য বুকের দুধের ব্যবস্থা যেভাবেই হোক করতেই হবে। যদি সে টানতে পারে তবে তো কথাই নেই। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত শিশুরা টানতে পারে না, হয়তো টানতে শুরু করল, কিন্তু দু'এক মিনিটের মধ্যেই তারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তাদের কান টেনে বা পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে দিতে হবে। তারপর কাঁধের ওপর ফেলে ঘুম কাটিয়ে আবার খাওয়ানো শুরু করতে হবে। যখন বুঝতে পারা যাবে যে তার পেট ভরেছে, তখন তাকে আবার কাঁধের ওপর ফেলে ঢেঁকুর তোলাতে হবে। এবার আস্তে আস্তে তাকে ডানপাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেওয়া চলবে। এই ব্যবস্থায় তার পাকস্থলী খালি হবে বা দৈবাৎ দুধ তুললে তা বালিশে গড়িয়ে পড়বে—নাক বা গলা বুজে যাবে না। নাক বা গলা বুজে যাওয়ার বিপদ কিন্তু অপুষ্ট শিশুদের সব সময়েই থাকে। এই শিশুরা বেশিক্ষণ টানতে পারে না বলেই তাদের বারবার খাওয়ানো

দরকার। দরকার হলে দু্ঘণ্টা অন্তর তাদের খাওয়াতে হবে নইলে তার পুষ্টি যথাযথ হবে না। শিশু ঠিকমত টানতে না পারলে সাবান দিয়ে হাত ও স্তন পরিষ্কার করে ধুয়ে বীজাণুমুক্ত বোতলে বুকের দুধ টিপে ধরতে হবে। রবারের নিপ্‌ল অনেকক্ষণ ফুটিয়ে নিলে নরম হয়ে যায়, ফলে বুকের চেয়ে অল্প আয়াসে শিশু বোতল থেকে দুধ টানতে পারবে, নিপলের গর্তটা একটু বড় করে দিলে টানবার সময়ে শিশু সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়বে না। প্রথম প্রথম সে প্রতিবার ½ আউন্স দুধ খাবে, তারপর ক্রমে তা ১½ থেকে ২ আউন্স পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিবারে ২ আউন্স খেতে পারলে শিশুকে দিনে ও রাতে ৩ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে। অপুষ্ট শিশুর মায়েদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ জায়গায় বুকের দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ হয় না। এমতাবস্থায় টিনের দুধ ব্যবহার করতেই হবে।

আর একটা জিনিস খুবই দরকার। অপুষ্ট শিশুকে সব সময়ে গরম রাখা চাই। এদের শরীরে চর্বি প্রায় থাকেই না, সাধারণ শিশুর মত এরা কাঁদতে বা হাত পা ছুঁড়তেও পারে না। ফলে তাড়াতাড়ি এদের দেহের উত্তাপ যেমন কমে যায় তেমনই তার শরীরকে গরম করে তুলতেও পারে না। মনে রাখতে হবে, তার শরীরের বৃহত্তম অংশ হ'ল তার মাথাটি। মাথায় সব সময়ে একটি গরম টুপি পরিয়ে রাখতে হবে। শরীরের উত্তাপ ঠিক আছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানতে হলে মাঝে মাঝেই পেট ও ঊরুর মাঝে থার্মোমিটার রেখে ঊরুটা চেপে এক মিনিট ধরে রাখতে হবে। শরীরের উত্তাপ যেন কোন সময়েই ৩৬° থেকে ৩৬·৫° সেণ্টিগ্রেড বা ৯৭°—৯৮° ফারেন-হাইটের নীচে নেমে না যায়। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যে একটা আন্দাজ হয়ে গেলে গায়ে হাত দিলেই উত্তাপ বোঝা যাবে। তখন আর থার্মোমিটার দরকার হবে না।

আগেই বলেছি, অপুষ্ট শিশুর দেহে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে খুব বেশি। এই শিশুর গায়ে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া যেন হাত দেওয়া না হয়। গায়ে হাত দেওয়ার আগে সম্ভব হলে ভাল করে হাত ধুয়ে নেওয়া উচিত। এই কারণে এই সময়ে খুব কম লোকই যেন শিশুটিকে ছোঁয়াছুঁয়ি করে। এদের শরীরে লৌহজাত পদার্থ কম থাকার জন্য রক্তাল্পতায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। ৮ সপ্তাহ বয়স থেকে তাকে লৌহজাত খাদ্যাদি দেওয়া দরকার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশ

বৃদ্ধি : অধিকাংশ শিশু, যারা পূর্ণ গর্ভাবস্থার পর জন্মায়, তাদের জন্মকালীন ওজনের দশ শতাংশ তার জন্মের পর প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে হ্রাস পায়। অপরিণত শিশুর ওজন তারও বেশি হ্রাস পায়। পুনরায় ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে শিশুর জন্মকালীন ওজন ফিরে পায়। প্রথম তিন মাস বয়েস পর্যন্ত তার দেহের ওজন দৈনিক প্রায় ২৫ গ্রাম করে বৃদ্ধি পায় এবং এই সময়ে প্রতি মাসে শিশুর ওজন এক কিলোগ্রাম করে বাড়া উচিত। দ্বিতীয় তিন মাসে তার অর্ধেক ওজন বৃদ্ধি পাবে এবং তারপরে ওজন বৃদ্ধির হার আরও কমবে। এই ওজন বৃদ্ধির হার ক্রমশ এই রকম হয় যে শিশুর ওজন প্রায় চারমাসেই তার জন্মকালীন ওজনের দ্বিগুণ হয় এবং এক বৎসর বয়সের সময় তার জন্মের ওজনের তিনগুণ মাত্র হয়। তার পরবর্তী সময়ে বছরে মাত্র ২ কেজি ওজন বাড়বে। সুতরাং প্রথম দিকে শিশুর ওজন বৃদ্ধি কম হারে হলে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই--এটা স্বাভাবিক। নিয়মিত শিশুকে ওজন করে তার রেকর্ড রাখা শিশুর ওজন বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিমাণ সূচী—কিন্তু একমাত্র পদ্ধতি নয়। কারণ, সব শিশুর ওজন একভাবে বাড়ে না। কোন কোন শিশুর ওজন ধীরে ধীরে বাড়ে। এই ধীরে বাড়া হয়তো তার মা-আত্মীয়স্বজন পছন্দ করবেন না। কিন্তু শিশুর পিতা ও মাতা যদি ছোটোখাটো হন, তবে তাঁদের শিশুও ছোট হবে। আবার কোনও শিশু হয়তো খুব দুরন্ত এবং স্বল্পাহারী, তাদের ওজন শান্ত স্বভাবের এবং উপযুক্ত আহারী ও বেশীর ভাগ সময় ঘুমিয়ে থাকা শিশুর মত কখনই হবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে—শিশু হাসিখুশী এবং সক্রিয় আছে কি না, তার খিদে হয় কি না, তার নিজস্ব ধরনে তার দেহের ওজন বাড়ছে কি না। অবশ্য শিশুর ওজন যদি স্বাভাবিকের অধিক হয়, তবে কিন্তু গর্বিত বা খুশী হওয়ার কোন কারণ নেই। তখন তার খাদ্যে সিরীয়াল ফুড এবং চিনির পরিমাণ কমাতে হবে। শিশুর জন্মের পর প্রথম কয়েক মাস তার মাথার উপরের নরম ব্রহ্মতালু আকারে বাড়তে থাকে কারণ তখন শিশুর মাথার ঘিলু (ব্রেন) বৃদ্ধি পায় এবং মাথার খুলির

হাড় সেই সঙ্গে ফাঁক হতে থাকে। ছয় মাস বয়স থেকে মাথার নরম জায়গাটা মাথার খুলির হাড়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হতে থাকে। দশ থেকে আঠার মাস বয়সের মধ্যে ব্রহ্মতালু শক্ত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়, এরপরও যদি ব্রহ্মতালু নরম থাকে, তবে চিকিৎসককে দেখানো উচিত। কারণ এ সময়ের পর ব্রহ্মতালু নরম থাকা রিকেট বা অন্য রোগের লক্ষণ হতে পারে।

প্রথম তিন মাসে শিশুর বিকাশ :

নবজাত শিশু সাধারণত উজ্জ্বল অথবা রঙচঙে জিনিষের উপর দৃষ্টি দিতে পারে এবং সামান্য দূর পর্যন্ত জিনিষগুলি তার দৃষ্টি-পথে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় মাসের শেষে সে ১৮০° পর্যন্ত জিনিষ-গুলি দেখতে পারে।

জন্মের প্রথম কয়েকদিন অধিকাংশ শিশু ভাল শুনতে পায় না। সেটা সম্ভবত তখন তার কানে কিছু জলীয় পদার্থ থাকে বলে। কিছুদিন পরে কান পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু শিশু তীক্ষ্ন শব্দ ও ধ্বনি প্রথম থেকেই শুনতে পারে। ৪—৬ সপ্তাহ বয়সে শিশু অবশ্যই তার সঙ্গে কথা বললে উপভোগ করবে। ৬ সপ্তাহ বয়সের শিশুর মা যখন তার সঙ্গে কথা বলেন, তখন সে মায়ের মুখের দিকে সানন্দে তাকিয়ে থাকে এবং মায়ের কথার প্রত্যুত্তরে সে হাসবে, আনন্দসূচক শব্দ করবে। নবজাত শিশুকে উপুড় করে শোয়ালে, তার মাথাকে পাশ করে দেবে। ৪ সপ্তাহের শিশুকে উপুড় করে শোয়ালে মুহূর্তের জন্য মাথা উঁচু করেই শিশু আবার বালিশে হেলে পড়বে। তিন মাস বয়সে শিশুকে উপুড় করে শোয়ালে আনন্দ পাবে এবং তার কনুই-এর উপর ভর দিয়ে মাথা ও বুক উঁচু করতে পারবে।

যে কোন জিনিষে হাত লাগলে নবজাত শিশু শক্ত মুঠোয় তা স্বাভাবিকভাবে আঁকড়ে ধরবে। আঙুল শিশুর হাতে লাগালে সে এতো শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে যে আঙুল দিয়েই তাকে শোওয়া অবস্থা থেকে তোলা যেতে পারবে। হাত মুঠো করে আঁকড়ে ধরা শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু নবজাতক আঁকড়ে ধরা হাতের আঙুল মেলতে পারে না। ক্রমে এই সহজাত শক্ত দৃঢ় মুষ্টি শিথিল

হতে থাকে। তিন মাস বয়সে শিশুর হাতে কোনও জিনিষ রাখলে শিশুর খুশীমতো সেটা ধরতে পারবে। খেলনা ধরতে শেখার আগেও শিশুর সামনে রঙীন জিনিষ ধরলে আনন্দে সে উত্তেজিত হয়ে ছোট দেহটিকে মোচড় দেবে তা ধরার জন্য।



যখন শিশু জন্মগ্রহণ করে, পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে সে অজ্ঞ থাকে। প্রয়োজনে কাঁদবে, অন্যথায় নিজেতেই মগ্ন থাকবে। ৪ থেকে ৮ সপ্তাহ বয়সে মা যখন শিশুর সঙ্গে কথা বলবেন তখন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে এবং মায়ের কথা বলার প্রত্যুত্তরে শিশুও হাসবে। তিন মাস বয়সে শিশু অপেক্ষা করবে কখন মা তার সঙ্গে কথা বলবেন এবং হাসবেন। মা'র হাসি ও কথায় সে আনন্দে দেহ মোড়াবে এবং নিজেও হাসবে। ৪ মাস বয়স হলে শিশুর সঙ্গে কথা বললে বা সুড়সুড়ি দিলে শব্দ করে হাসতে শিখবে। তখন সে সঙ্গপ্রিয় ক্ষুদে মানুষটি। যতক্ষণ জেগে থাকবে, কথা বলতে এবং খেলতে চাইবে।

দুই মাস বয়সের সময় শিশু নিজের মনেই 'ও ও' 'আ আ' এই ধরনের শব্দ করবে। কিন্তু তিন মাসে সে নিশ্চয়ই বড়দের তার সঙ্গে কথা বলার উত্তরে আনন্দসূচক ধ্বনি করতে শিখবে। বাচ্চারা স্বভাবতই আমুদে এবং বন্ধুভাবাপন্ন ছোট জীব। তাকে সেই ভাবে শিষ্ট আদর মাখানো যত্নে পালন করতে হবে। কিন্তু সব সময় শিশুকে নিয়ে আদর করার ইচ্ছা হ'লেও তা অনুচিত কেন না তাতে ভবিষ্যতে শিশুর স্বভাব খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। মা যখন শিশুর ঘরে থাকেন, তার সঙ্গে কথা বলেন, হাসেন, তখন অন্যান্য মানুষকে শিশুকে কচলাতে বা রাগাতে দেওয়া উচিত নয়। **কিছু মানুষ আছেন যারা শিশুকে রাগিয়ে মহা আনন্দ পান। সেটা কিন্তু আপনার শিশুর পক্ষেই ক্ষতিকর।**

তিন মাস থেকে ছয় মাস:

চার মাস বয়সে শিশুকে উপুড় করে শোয়ালে সে বেশ ভাল করে মাথা উঁচু করতে পারবে। এমনকি মাথা উঁচু করে এদিক-ওদিক

তাকাতেও পারবে। তার পিঠ ও ঘাড়ের পেশী ততদিনে বেশ শক্ত হয়ে যায়। তখন শিশুকে ধরে বসালে তার পিঠ সোজা থাকবে। অবশ্য নাড়া খেলে মাথাটা থর থর করে একটু কাঁপবে।

ছোট শিশু প্রায়ই চিত হয়ে শোয়। এ সময় তার হাত দুটোকে একসঙ্গে সামনের দিকে এনে মুখে পুরে ফেলতে শুরু করবে। চিত হয়ে শুয়ে হাত ও পা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে শিশু খেলা করে থাকে। অধিকাংশ সময় চিত হয়ে শোয়ার ফলে শিশুর মাথার পিছন দিকে ঘসায় ঘসায় চুল উঠে গিয়ে টাকের মত পড়ে। কিন্তু সে চুল নিশ্চয়ই আবার গজাবে।

শিশুর বয়স মাস চারেক হলে—ঝুনঝুনিজাতীয় খেলনা নাগালে পাবার চেষ্টায় তার দেহকে এগিয়ে দিয়ে হাত বাড়াবে। মাঝে মাঝে সে তার শোবার জায়গা থেকে ছিটকে গিয়ে খেলনা ছুঁতে চেষ্টা করবে। যেই খেলনা পাবে অমনি তা টেনে এনে মুখে পুরবে।

পাঁচ মাস বয়সে শিশুর মাথা দিব্যি শক্ত হয়ে যাবে। দেখবেন তখন সে নিজের মাথা দৃঢ়ভাবে তুলতে পারছে, নাড়ালেও সামনের দিকে মাথা হেলে পড়ছে না। এই সময়ে আপনার শিশু কোলে বসে খেলনা নিয়ে খেলতে ভালবাসবে। ছয় মাসে শিশু খেলনা বস্তু হাত বাড়িয়ে ভালভাবেই আঁকড়ে ধরতে পারবে। প্রথম প্রথম সে জিনিষ ধরতে গিয়ে সমস্ত হাত দিয়ে কোদালের মত আঁকড়ে নিতে চাইবে। ক্রমে নয় মাস বয়স নাগাদ সে তার বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে মুড়ি জাতীয় ক্ষুদ্র বস্তুও তুলে নিতে পারবে। ৫ মাস বয়সে উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন জিনিষ আঁকড়ে ধরা থেকে ৯ মাস বয়সে নির্দিষ্ট কোন জিনিষ দুই আঙুল দিয়ে ধরা—এটা একটা "দ্রুত অগ্রগতি" এই সময়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে কারণ শিশু নানা রকম ছোট জিনিষ তুলে নিয়ে মুখে পুরবে।

৫—৬ মাস বয়সে শিশু পাশ ফিরতে শেখে। তখন আবার আপনাকে সাবধান হতে হবে যাতে সে গড়িয়ে বিছানা থেকে না পড়ে যায়।

৬ মাস বয়সে সে হাতে ঠেকা দিয়ে বসতে পারবে। অবশ্য দৃঢ়ভাবে নয়। এই সময়ে শিশুকে ধরে দাঁড় করালে সে পায়ের উপর নিজের দেহের ভার রাখতে পারবে।

ছয় মাসের শেষের দিকে শিশুরা মানুষ চিনতে শুরু করে। মাকেই তার বেশী পছন্দ। বাইরের মানুষ দেখে তারা বিচলিত হতে পারে। আমাদের দেশে যৌথ পরিবারের বৃহৎ পরিধিতে আত্মীয়স্বজনেরাও বাড়ির শিশুকে আদর-যত্ন করেন। তাদের নিয়ে খেলা করেন। সেইসব পরিবারের শিশুদের খুব একটা মুখ-চেনা থাকে না। কিন্তু ক্ষুদ্র পরিবারের শিশু প্রায়ই বাইরের লোক দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কাঁদবে। শিশুর বিকাশের এটা একটা স্বাভাবিক পর্ব। অবশ্য আপনি চাইবেন আপনার শিশু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খেলা করুক। হাসুক এবং এভাবে সকলের আনন্দ দান করুক এবং সকলের আদর কুড়িয়ে নিক। কিন্তু সাত মাসের ছোট শিশুটি সেরকমটি না করলে চিন্তিত বা হতাশ হবেন না। শিশু নিজে থেকেই তার এই পর্ব অতিক্রম করবে। আপনি শিশুর এই ভীতির কারণ বুঝবার চেষ্টা করুন। যদিও এই সময়ে অচেনা লোক দেখলে শিশু বিচলিত হয় কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার শিশুরা অন্য বাচ্চা বা গৃহপালিত ছোট জন্তু দেখে বিচলিত হয় না।

আট থেকে নয় মাসের মধ্যে শিশু নিজে বেশ দৃঢ় ভাবে বসতে পারবে, তখন মায়ের বিরাট অব্যাহতি। কারণ তাঁর সন্তান তখন মেঝেতে বসতে শিখে খেলনা নিয়ে নিজেই খেলা করতে পারবে। তাকে একাকী খেলতে দিন, লক্ষ্য রাখুন শিশু কিছু মুখে দিচ্ছে কি না।

ছয় থেকে বার মাস : আট মাস বয়সে শিশু মুখে স্বরবর্ণের 'ও ও' 'আ আ' বোল ক্রমে 'বাবা' 'মা'-তে পরিবর্তিত হতে শুরু করবে। কিন্তু এগুলো কেবল বিচ্ছিন্ন শব্দ উচ্চারণ মাত্র—কোনও নির্দিষ্ট পদার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। নয় মাসের পর থেকে সে নিজের নামের সঙ্গে পরিচিত হতে শিখবে এবং শিশুর নাম ধরে ডাকলে আহ্বায়কের মুখের দিকে তাকাবে। 'বাবা কোথায় ?' বললে শিশু বাবার দিকে তাকিয়ে নিজের বাবাকে ইঙ্গিত করবে। এক বছর বয়সে সে 'বাবা মা' বোল অতিক্রম করে দু-একটা অর্থযুক্ত শব্দ উচ্চারণ করবে। এছাড়াও অন্যান্য অনেক শব্দ যেমন 'না··· না' ইত্যাদি শিশু বুঝতে পারবে।

নয় মাস বয়সে হাতে তালি দেওয়া, হাত তুলে বাই-বাই করা ইত্যাদি উপভোগ করতে পারবে এবং শিশু এই খেলা অনুসরণ করতে শিখবে। এই সময়ে শিশুরা হামা দিতেও শেখে। অনেক শিশু আবার হামাই দেয় না—একেবারে হাঁটতে শেখে।

দশ মাসে শিশুর হাতে থাকা কোনও জিনিস মা চাইলে সে অমনি তা মায়ের হাতে রাখবে, কিন্তু কখনই দিয়ে দেবে না। কিন্তু এক বছর বয়স হলে তার কাছে কিছু চাইলে শিশু তা দিয়ে দেবে।

বছর খানেক বয়সে শিশু হাঁটা শুরু করে। কেউ কেউ ৯—১০ মাসেই হাঁটে। আবার স্বাস্থ্যবান শিশু ১৮ মাসের আগে নিজের ক্ষমতায় হাঁটতে চাইবে না। শিশুর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক হলে এই বিষয়ে আপনার কিছু করার নেই। তার দেহের পেশী ও স্নায়ু হাঁটুবার উপযুক্ত হলে নিজে থেকেই সে হাঁটতে আরম্ভ করবে। কিছু বাচ্চা আছে যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ বেশ ভাল ভাবেই হাঁটতে পারলেও যেন বড়দের হাত ছেড়ে দিয়ে স্ব-নির্ভর হতে সাহস পায় না। পক্ষান্তরে অনেক বাচ্চা আবার ভালভাবে হাঁটতে শেখার আগেই বড়দের সাহায্য না নিয়ে স্বাধীনভাবে হাঁটতে চায় আর বার বার পড়ে যায়। তারা টলমল করতে করতে হাঁটার সময় ছোট পা দুটিকে অনেকটা ফাঁক করবে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য। এরা হাঁটার সময় সর্বদা এদের সঙ্গে সঙ্গে বা পিছনে পিছনে কাউকে থাকতে হয় এবং এটা খুবই কষ্টকর। একব্যর হাঁটতে শিখলে অনেক শিশু আর থামতে চায় না, প্রায়ই হাঁটার বায়না ধরে, মায়ের পক্ষে এটা কষ্টকর হয় এবং তাকে কোলে তুলে নেওয়াটাই স্বস্তির মনে হবে। প্রায়ই মা-বাবা শিশুদের পা বাঁকা দেখে উদ্বিগ্ন হন। হাঁটতে শেখার সময় সব বাচ্চার পা-ই বাঁকা থাকে। ভালভাবে হাঁটতে শেখার পর ক্রমশ সেই পা সোজা হতে থাকে।

শিশুদের বিভিন্ন বয়সে দাঁত ওঠে। মায়েরাও সেটা আশা করেন, ঠিক ৬ মাস বয়সে যদি শিশুর দাঁত ওঠে। কোন কোনও বাচ্চার ৩ মাসেও দাঁত উঠতে আরম্ভ করে, আবার বেশ স্বাস্থ্যবান বাচ্চার দাঁত ১ বছর বয়সের আগে ওঠে না। আপনার শিশুর স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে এবং তাকে প্রয়োজনমত ভিটামিন দেওয়া হয় তাহলে দাঁত ওঠার জন্য আপনাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

কারণ ভিটামিন ও ক্যালসিয়ামে কোন পরিবর্তন ঘটায় না। স্বাস্থ্যবান শিশুদের দেহে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন যথেষ্ট আছে।

সাধারণত শিশুর যখন প্রথম দাঁত উঠতে আরম্ভ করে, তখন তার মুখে খুব লালা ঝরে। সেইজন্য শিশুকে গলায় বীব পরাতে হয়। এই সময়ে শিশু খিটখিটে মেজাজের হয়, খুব কাঁদে এবং হাতের মুঠো বার বার মুখে ঢুকিয়ে দিতে চায়। কারণ প্রথম দাঁত ওঠার সময় মাড়িতে খুব ব্যথা হয়। দুধ ও অন্যান্য খাবার খেতেও শিশুর কষ্ট হয়। শক্ত কোন বস্তু, যেমন—শক্ত রুটি বা পাউরুটির টুকরো অথবা ষ্টীলের চামচ শিশুকে চিবোতে দিলে তার আরামও লাগবে, মাড়ি থেকে দাঁত বার হতেও সাহায্য করবে। প্রবৃত্তিগতভাবে শিশুও নিজেই যে কোন বস্তু টেনে নিয়ে মুখে পুরে মাড়িতে প্রচণ্ডভাবে ঘসতে থাকবে। অনেক বাচ্চার দাঁত ওঠার সময় জ্বর হয় এবং পাতলা পায়খানা হয়। মনে হয় দাঁত ওঠার কালে তাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে সহজেই রোগ সংক্রমণ হয়। সুতরাং এই সব রোগের চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। একে কেবলমাত্র দাঁত ওঠার জন্য হওয়া এবং দাঁত উঠে গেলে সেরে যাবে ভাবা অনুচিত।

প্রথম দাঁত উঠতে দেরী হলেও পরের দাঁত পর পর উঠে যাবে। অধিকাংশ শিশুর আড়াই বছর বয়সের মধ্যে ২০টা দুধের দাঁত উঠে যায়।

দাঁত ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাশ ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়। দুই বছর বয়স হলে টুথব্রাশ ব্যবহার করতে দেওয়া যায়। কারণ এই বয়সে বাচ্চারা অনুসরণ করতে ভালবাসে। যখন তারা বড়দের দাঁত ব্রাশ করতে দেখবে, তখন তারাও চাইবে নিজেদেরটা ব্রাশ করতে।

ছয় মাসের শিশু যা কিছু পায় মুখে পুরে দেয়, শিশুর বয়স বছর খানেক হলে তার মুখে তোলার অভ্যেস কমে যায় সাধারণত। তখন তার ঝোঁক ক্রমে খেলার দিকে যাবে। এ বয়সে তার প্রিয় খেলা হল সব কিছু ছুঁড়ে ফেলা এবং আপনি সেটা আবার তুলে দিলে আবার সে ছুঁড়ে ফেলবে। কিছুক্ষণ এরকম খেলার জন্য সঙ্গ দিতে আপনারই ভালো লাগবে—পরে যদি আপনার ক্লান্তি আসে তাহলে কিছু খেলনা দিয়ে বাচ্চাকে মেঝেতে বসিয়ে দেবেন।

শৈশবের দিনগুলি : (শিশু যখন টলমল করে হেঁটে বেড়ায়)

এক থেকে তিন বছর :

প্রথম বছরে শিশু যে হারে বেড়েছে সে হারে পরবর্তী বছরে বাড়বে না। ওজন বছরে তার মাত্র দুই কেজি থেকে আড়াই কেজি বাড়বে। শিশুকালের নাদুস-নুদুস ভাব লম্বা হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং দৌড়াদৌড়ি করার ফলে চলে যাবে।

এক বছর বয়সে শিশু তার হাত দুটি শক্ত করে পা ফাঁক করে টলে টলে হাঁটতে আরম্ভ করবে। কিন্তু দুই বছর বয়সে সে দিব্যি চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করবে। আঠার মাস বয়সেই সে হাত ও রেলিং ধরে সিঁড়ি বেয়ে ওপর-নীচ করতে পারবে। নিজে চেয়ারে উঠে বসতে পারবে। আর শিখবে নিজে নিজে খেতে যদিও খাবার-গুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে নোংরা করে ফেলবে। অধিকাংশ মা তাই বাচ্চাকে খাইয়ে দেওয়া সহজতর কাজ বলে মনে করেন। তাতে খাওয়া তাড়াতাড়ি হয়, নোংরাও কম হয়। কিন্তু আমার মনে হয় বাচ্চাকে নিজে খেতে দেওয়া ভাল। দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে যখন শিশু ইতস্তত ছুটোছুটি করতে শিখবে, তখন তার দিকে সর্বদা নজর দিতে হবে। এই বয়সের অনভিজ্ঞ শিশু কৌতূহল নিয়ে সমস্ত কিছু দেখতে শুনতে চাইবে এবং নানারকম জিনিসপত্র যেমন খালি বাক্স টেনে মেঝেতে ফেলবে। এর জন্য তাকে বকাবকি করা অনুচিত। এটা শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল—জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে তারা জানতে ও বুঝতে চায়। সব সময় নজর রাখতে হবে যাতে ভঙ্গুর জিনিষ, ওষুধ এবং বিষাক্ত দ্রব্য শিশুদের নাগালের বাইরে থাকে।

দেড় বছর বয়সে বাচ্চারা কাঠের ব্লক দিয়ে আকৃতি তৈরী করতে পারবে। তারা ছবির বই দেখতে ভালবাসবে এবং কুকুর-বিড়াল প্রভৃতির ছবি দেখে বলতে পারবে কোনটা কী। এই সময়ে ছবির বই-এর সঙ্গে শিশুর পরিচয় করিয়ে দেবেন। নাক, চোখ, কান কোথায়--জিজ্ঞাসা করে করে শিশুকে দেখাতে বললে শিশু খুব উপভোগ করবে।

কোনও কোনও শিশু ১৮ মাস বয়সেও কোন শব্দ উচ্চারণ করে না। যদি সে কথা শুনতে ও বুঝতে পারে এবং নিজস্ব অর্থহীন

আওয়াজ করতে পারে, তবে সে নিশ্চয়ই কথা বলতে পারবে। সুতরাং এর জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া নিষ্প্রয়োজন। অনেক শিশু তার নিজের ঢঙে দুর্বোধ্য ভাষায় বকবক করে যায়। আমরা তার অর্থ বুঝি না, কিন্তু এটাই তার কথা বলার পূর্বাভাস। দেখা যায়, যে শিশুরা ১৮ থেকে ২০ মাস পর্যন্ত কথা বলতে দেরী করে, তারা হঠাৎ কথা বলা শিখে ফেলেই নানা রকম শব্দ এত দ্রুত আয়ত্তে আনে যে দ্বিতীয় জন্মদিনে তারা তিনটি শব্দে তৈরী বাক্য বেশ বলতে পারে।

একথা বুঝতে হবে যে সব শিশুর বিকাশের সময়ানুপাত এক নয়। কোন শিশু ১০ মাস কিংবা ১৫ মাস হলে হাঁটতে শিখল অথবা ১০ কিংবা ২০ মাসে কথা বলতে শিখল সেটাই তার স্বাস্থ্য অথবা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। শিশু শিশুতে এ ধরনের পার্থক্য স্বাভাবিক। একটিমাত্র পরীক্ষায় তা নির্ধারণ করা যায় না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিশুর বিকাশের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বছরে শিশু প্রচণ্ড অনুকরণপ্রিয় হয়। মায়ের গৃহস্থালী কাজকে সে অনুকরণ করতে চাইবে। তবে সাধারণত এ বয়সে সে অন্যান্য শিশুর মধ্যে থেকেও নিজের খেলাতেই মগ্ন থাকে। একেই বলা হয় সমান্তরাল খেলা (প্যারালাল প্লে)। বল নিয়ে খেললেও সে নিজেই সেটা ছুঁড়বে, আবার নিজেই তার পিছনে ছুটে তা তুলবে! তিন-চার বছর বয়সে শিশু অপর শিশুদের সঙ্গে মিশে খেলতে শিখবে।

১৮ থেকে ২০ মাস বয়সে শিশু মলমূত্র ত্যাগের সময় ইঙ্গিত করতে পারবে। আমাদের ভারতীয় মায়েরা তাঁদের শিশুদের প্রথম কয়েক মাস থেকেই শব্দ করে 'হিসি' করতে শেখান—দেখা যায় এতে অনেকে সার্থকও হন। যাহোক, শিশুদের প্রস্রাবের বেগ সংযত করতে পারার চেয়ে মায়েদেরই শিশুকে সময়মত প্রস্রাব করতে সাহায্য করা বেশি উচিত। অনেক শিশু-মানসিক চিকিৎসক বিশ্বাস করেন যে দুই বৎসর বয়সের আগে শিশুদের মল ত্যাগের ট্রেনিং দিলে তারা এতে বাধা দেবে এবং ভবিষ্যতে বিরূপ মানসিকতা গড়ে উঠবে। ফলে শিশু বড় হবার পর একটা সমস্যা সৃষ্টি করবে। সৌভাগ্য-

বশত ভারতীয় মায়েরা মল ও মূত্র ত্যাগের ট্রেনিং সম্বন্ধে মাথা কম ঘামান। হয়তো তারই জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্যায় তাঁরা ক্বচিৎ ভোগেন। দেখা যায় বছর খানেক বয়সের পর শিশুরা সাধারণত প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে পায়খানা করে। সকালের খাবার খাওয়ার পরই বেশীর ভাগ শিশুর পায়খানা হয়। আমার মনে হয় এ বয়সের শিশুকে ছোট কোন মলাধারের (পটি) উপর বসতে অভ্যাস করানো ভাল। শিশু যদি তাতে বসতে না চায় তবে জোর করা ঠিক নয়। জোর করে বসালে সে ভয় পাবে এবং মলাধারে বসাবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। বরঞ্চ যে শিশু তা জন্য নির্দিষ্ট মলাধারে বসতে চাইবে না, তাকে খেলনা এবং ছবির বই দিয়ে পায়খানায় বসালে সেগুলির দিকেই বেশি আকৃষ্ট হবে এবং পায়খানা করার সময়টা শান্ত থাকবে। শুধু তাই নয়, হাতের খেলনা নিয়ে খেলতে খেলতে বা ছবির বই দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ ধরে সে পায়খানা করবে এবং তার পায়খানা পরিষ্কার হবে। শিশু যদি মলাধারে বসতে ভয় পায়, তবে তাকে টেনে হিঁচড়ে বসাবার চেষ্টা করা উচিত হবে না। সেটা শিশুর কাছাকাছি রেখে দেখাতে হবে এবং তাতে বসাবার অভ্যেস করার ধীর প্রয়াস চালাতে হবে। পরে ঠিক যখন তার পায়খানা হবে তখন তাতে বসাতে হবে। তবে বড়দের মলাধারে শিশুকে বসানো আদৌ উচিত নয় কারণ শিশুর পা মাটি অবধি পেঁছায় না এবং শিশুও নিরাপদ মনে করে না। শিশুকে তার উপযুক্ত ছোট মলাধারে বসালে তার পা মাটিতে থাকবে এবং নিরুদ্বেগচিত্তে বসতে পারবে।

দুই বছরের শেষে পায়খানার বেগ হলে অবশ্যই শিশুদের মুখের চেহারা পাল্টে যাবে—সে খেলা বন্ধ করে দেবে এবং স্তব্ধ হয়ে একদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ কেউ আবার দু-একটা শব্দে তার প্রয়োজন প্রকাশও করবে। সে সময় তাকে তার জন্য নির্দিষ্ট মলাধারে বসতে সাহায্য করতে হবে। আরও একটা সমস্যাও এই বয়সে দেখা যায়—সেটা হল শিশু তখন খেলা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে মলাধারে বসে পেট পরিষ্কার করে সময় নিয়ে পায়খানা করার অবকাশ তার থাকে না, প্রথম বেগের একটু পায়খানা করেই সে পায়খানা থেকে উঠে এসে ছুটে খেলতে শুরু করে দেয়। এর ফলে তার কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেবে, পেটের মল কঠিন হবে এবং

পায়খানা করাও যন্ত্রণাদায়ক হবে। তারপর আর সে পায়খানা করতে চাইবে না। এইরকম ক্রমাগত হলে অবশেষে তার কোষ্ঠ-কাঠিন্যের ধাত গড়ে উঠবে। সুতরাং শিশুর পায়খানার সময় তার সঙ্গে কথা বলে, তাকে ছবির বই দেখিয়ে বা তার সঙ্গে খেলা করে তার মনকে শিথিল রেখে পরিষ্কার করে পায়খানা করাবার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করা উচিত।

কতিপয় শিশু-বিশেষজ্ঞের মতে শিশুদের মলত্যাগের ট্রেনিং দেওয়া আদৌ উচিত নয়। তাঁদের মতে দুই-আড়াই বছরের শিশুদের মলাধারে বসাবার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য কোনও ক্ষেত্রেই জোরাজুরি করা ঠিক নয়। তাঁদের মতে এই বয়সী শিশুরা স্বভাবতই অনুকরণপ্রিয় হওয়ায় বড়দের দেখাদেখি তারা নিজেরাই মলাধারে বসে পায়খানা করতে চাইবে। পক্ষান্তরে তাদের উপর মলাধারে বসা আরোপ করলে 'না' বলে বেঁকে বসবে। কারণ বাচ্চারা বড়দের আরোপিত আদেশ 'না' বলে বাতিল করতে ভালবাসে। আদেশ নয়, মলাধারে বসার জন্য বড়দের স্নেহব্যঞ্জক অনুরোধ শুনে শুনে এবং বড়দের পায়খানায় বসা অনুকরণ করে দুই-আড়াই বছরের শিশুরা স্বেচ্ছায় তাদের মলাধারে বসে পায়খানা করবে। এতে কোন সমস্যাও উপস্থিত হবে না। কিন্তু আমার মত হ'ল—যে বয়সে শিশু তার মলত্যাগের বেগ জ্ঞাপন করতে পারবে, তখন থেকেই তাকে তার জন্য নির্দিষ্ট মলাধারে বসাবার চেষ্টা করা শ্রেয়। অনেক শিশু কোন সমস্যা সৃষ্টি না করেই মলাধারে বসে পায়খানা করবে, যারা এইরকম করতে চাইবে না, তাদের ক্ষেত্রে দুই-আড়াই বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তখন বড়দের দেখাদেখি তারাও তাদের মলাধারে বসে পায়খানা করবে। এই বয়সের শিশুরা অনেকটা স্বনির্ভর হয়। তাই নিজেরাই বসে পায়খানা করতে পারবে, কেবলমাত্র শোচানোর ব্যাপারে সাহায্য প্রয়োজন হবে।

মলত্যাগের পর প্রস্রাবকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপার আসে। ১৫—১৮ মাসের মধ্যে শিশু প্রস্রাব করে পোশাক ভিজিয়ে ফেললে তা প্রকাশ করার কায়দা অর্জন করতে পারবে। এটাই প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারার পূর্বাভাস। দুই বছরের শেষে তার প্রস্রাবের উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আসবে। অবশ্য বড়দেরও উচিত খেলায় ব্যস্ত শিশুদের প্রস্রাব

করার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। অনেক বাচ্চা এই বয়সেও রাত্রে বিছানা ভিজিয়ে দেয়। শিশুরা বিভিন্ন বয়সে রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব ত্যাগ করে। কোনও শিশুর মাত্র এক বছর বয়সেই সারারাতে বিছানায় প্রস্রাব করে না। তবে অধিকাংশ বাচ্চারা বছর তিনেক বয়সে বিছানায় প্রস্রাব বন্ধ করে।

দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে সময়টা বড় কঠিন। এই বয়সটা না-ধর্মী অর্থাৎ অস্বীকার করার বয়স। এ সময়ে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটতে সুরু করে। এ সময়ে তার প্রচণ্ড উদ্যমশক্তি থাকে। সে তখন নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকে এবং কেউ কিছু বললে বিরক্ত হয়। পিতামাতা তাকে কোন অনুরোধ করলে বা কোন আদেশ করলে প্রত্যুত্তরে অধিকাংশ সময় '···না···না' বলে উঠবে, যা তাঁরা না বলবেন সেটাই করে বসবে। এই যে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এটা প্রত্যেক শিশুর চরিত্র বিকাশের একটা পর্যায়। শিশুর মতের বৈপরীত্য করা এ সময় উচিত নয়। বড়দের কথামতো জোর করে চলতে বললে যুক্তিহীন এবং একগুঁয়েমীর কাজ হবে। শিশু আরও উঠে-পড়ে বড়দের বিরোধিতা করবে আর তার আহত আবেগকে বদ মেজাজ দেখিয়ে নিবৃত্ত করবে। সুতরাং যথাসম্ভব বাচ্চাদের তাদের মতই থাকতে দেওয়া উচিত। তাদের আদেশের সুরে হুকুম না করে চিন্তা ও ধারণা সঞ্চার করে প্রস্তাব উপস্থাপনার মাধ্যমে তাদেরও বড়দের মতের সামিল করাতে হবে। তাতে সে বড়দের সঙ্গে সহসখীত্ব অনুভব করবে, বড়দের আদেশকে আদেশ হিসাবে নেবে না। নিত্য-প্রয়োজনীয় কাজ—যেমন স্নান করতে বলতে হবে না। শিশুকে স্নানের জন্য নিয়ে গেলেই হবে, তার জন্য যুক্তি-তর্কে না যাওয়াই ভাল। যখন শিশু এমন কিছু করবে যা তার না করাই ভাল, তখন তাকে নিষেধ না করে সেই কাজ থেকে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রাক্-বিত্যালয় বৎসর :

তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বৎসর সময়ে শিশুরা ক্রমশ ওজনে প্রায় ২ কিগ্রা এবং লম্বায় ২½ থেকে ৩½ ইঞ্চি করে প্রতি বছর বাড়তে থাকে। সে তার শিশুসুলভ গোলমাল ভাব হারিয়ে ফেলে এবং প্রায় ২½ বৎসর বয়সে তার ২০টির মতো দাঁত উঠে যায়।

তিন বৎসরের শিশু আস্তে আস্তে এক পা, এক পা করে দুটো পা ব্যবহার করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারে। এবং তার পরের বছর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতেও সক্ষম হয়। ২ বৎসরে বাচ্চা কাগজ ও রঙিন পেনসিলের সাহায্যে কিছু গোলাকার হিজিবিজি লিখতে পারে এবং সমান্তরাল সরলরেখা আঁকতে পারে, কিন্তু ৩ বছর বয়সে সে আড়াআড়িভাবে লাইন টানতে পারে এবং বৃত্ত আঁকতে পারে। সে তার বয়স এবং স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ জানতে পারে ও তিন পর্যন্ত পদার্থ গুণতে পারে।

৪ বৎসরে সে এক পায়ে লাফ দিতে পারে এবং কাঁচি দিয়ে ছবি কাটতে পারে। সে আদিম মানুষের ছবিও আস্তে আস্তে আঁকতে পারে। তার কথা স্পষ্ট হয়ে যায় এবং সে অনর্গল, অসংখ্য অর্থহীন প্রশ্ন করতে শুরু করে এবং অনেক কাল্পনিক গল্প বলতে সক্ষম হয়। ছোটবেলার মতো সে তার মা বা ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে বসে বসে খেলতে চায় না বরং অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে বল খেলা শুরু করে।

বিকাশের পদ্ধতির পরিবর্তন :

সব সময় বিকাশের পদ্ধতির অনেক রকম পরিবর্তন হয়ে থাকে। তাই বেশীর ভাগ বাচ্চারা প্রায় ৬ সপ্তাহ বয়সে একটু একটু হাসতে শেখে আবার কিছু বাচ্চা জন্মের কয়েকদিন পর থেকেই হাসতে পারে। অধিকাংশ শিশু ৮ মাস বয়সে নিজে নিজে বসতে পারে কিন্তু কিছু স্বাভাবিক বাচ্চা আবার এক বছরের আগে একা একা বসতে পারে না। অনেক সময় শোনা যায় যে এক একটা বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু করতে পারে। অধিকাংশ শিশু ৪ মাস পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করতে পারে এবং ৬ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে। মোটামুটিভাবে ভারতীয় শিশুরা পাশ্চাত্যের শিশুদের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি শারীরিক নৈপুণ্য দেখাতে সক্ষম হয়। এর কারণ মনে হয় আমাদের মায়েরা বাচ্চাদের মেঝেতে ছেড়ে দেয় এবং যার ফলে সে ওল্টাতে, বসতে, হামাগুড়ি দিতে এমন কি বিছানা ধরে সহজেই দাঁড়াতে শেখে, কিন্তু পাশ্চাত্যের শিশুরা কাঁথায় জড়িয়ে খাটের মধ্যে বহুদিন পর্যন্ত শোয়ানো থাকে ফলে তারা দক্ষতা দেখাবার সুযোগ একেবারেই পায় না। শিক্ষার একটা বৃহত্তম দিক হচ্ছে অভ্যাস।

যাই হোক, যে যে সময়ই শিখুক না কেন, অবশেষে সব শিশুরা একই রকম দক্ষতাসম্পন্ন বা দক্ষতাহীন হয়ে যায়।

শিশুর পরিবেশের উপরই তার বিকাশ অনেক মাত্রায় নির্ভরশীল। সেজন্য যে সব শিশুর স্নেহশীল বাবা-মা বা দাদা-দিদি আছে যারা তার সঙ্গে সবসময় কথা বলে, গান গায় এবং খেলা করে সে সব শিশুরা স্বভাবতই খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু শিখতে পারে। কিন্তু যে সব শিশুরা স্নেহ থেকে বঞ্চিত ; যেমন কোন প্রতিষ্ঠানে পালিত শিশুরা সারাক্ষণ খাটে শুয়ে থাকে বলে তারা বসতে, হামাগুড়ি দিতে অথবা তাড়াতাড়ি হাসতে শেখে না বা তাদের শেখার ইচ্ছেও প্রায় থাকে না বললেই চলে এবং যদি বা শেখে তবে খুব ভালো ভাবে শেখে না। আবার যদি কোন বাচ্চার মা সারাদিন ব্যস্ত থাকে অথবা বাচ্চাকে সারাদিন একা একা ফেলে রাখে তবে সেই বাচ্চাও সমানভাবে বঞ্চিত হয়।

তাছাড়া, প্রত্যেক পরিবারেই কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত যে বাচ্চার মায়েরা আস্তে আস্তে কথা বলে তাদের বাচ্চারা দেরীতে কথা বলা শেখে কিন্তু একবার বলা শুরু করলে তারা তিন বছর বয়সে তাদের সঙ্গীদের মতোই খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারে।

আবার অত্যধিক অসুস্থতার জন্যও শিশুদের বৃদ্ধি দেরীতে হয় কিন্তু এটা খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং কিছুদিনের মধ্যেই তার বৃদ্ধি হতে শুরু হয়।

শিশুর ব্যক্তিত্বও তার বিকাশের হারকে প্রভাবিত করে। সেজন্য একটি কর্মঠ ও সাহসী শিশু একটি ধীর এবং শান্ত শিশুর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বসতে এবং হাঁটতে শেখে।

বাচ্চা মেয়েরা সাধারণত খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে, হাঁটতে এবং খেলতে পারে।

যদি সময়ের আগে কোনও বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে থাকে তবে তার সবকিছু শিখতে একটু বেশী সময় লাগে। যদিও কোনও বাচ্চা নির্দিষ্ট তারিখের ২ মাস আগে জন্মগ্রহণ করে থাকে তবে প্রথমেই তাকে ২ মাস সময় দেওয়া উচিত যার পর থেকে অন্য শিশুদের মতো তারও বৃদ্ধি শুরু হবে। যদিও এরকম বাচ্চারা এক বছর বয়সে

আর অন্য সব বাচ্চার মতোই সমান দক্ষতাসম্পন্ন হয়। সাধারণত যদি এসব বাচ্চারা জন্মাবার পরই অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তা সেরে উঠতে অনেক সময় লাগে এবং তার বৃদ্ধিও খুব আস্তে আস্তে শুরু হয়। এই সকল ক্ষেত্রে তাকে একজন শিশু-বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে রাখা উচিত যিনি তার মানসিক বিকাশ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন।

সাধারণ বিকাশের হার নির্দেশক

প্রথম—চতুর্থ সপ্তাহ :

প্রবণতা—হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে পারে এবং মাথা এপাশ-ওপাশ করতে পারে ও চতুর্থ সপ্তাহ থেকে তুলতেও চেষ্টা করে।

দৃশ্যমান—মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে এবং আলোর দিকে তাকাতে পারে। মানুষের মুখকে অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দ করে এবং চলন্ত বস্তুর দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি অনুসরণ করতে পারে।

অষ্টম সপ্তাহে :

প্রবণতা—কিছুক্ষণ মাথা তুলে রাখতে পারে।

দৃশ্যমান—১৮০° অর্থাৎ সরল পথে কোনও পদার্থকে দেখতে পারে।

সামাজিক—সামাজিক সংস্পর্শে হাসে, শব্দ শোনে এবং মৃদুস্বরে শব্দ করে।

দ্বাদশ সপ্তাহ :

প্রবণতা—হাতের উপর ভর দিয়ে মাথা এবং বুক তোলে।

দক্ষতা সহকারে ব্যবহার—জামাকাপড় টানে এবং খেলনা ইত্যাদি ধরতে পারে। কোনও বস্তুকে ধরবার চেষ্টা করে।

সামাজিক—যখন কথা বলা হয় তখন আনন্দে একটানা চিৎকার করে।

ষোড়শ সপ্তাহ :

প্রবণতা—মাথা এবং বুক লম্বভাবে তুলতে পারে।

ধরে বসা—চারিদিকে মাথা সোজা রেখে চোখ ঘোরাতে পারে।

নিপুণতা—বস্তুকে নাগালের মধ্যে আনে। দু'হাত একসঙ্গে নিয়ে খেলা করে।

সামাজিক—খেলনা এবং কোনও লোককে দেখলে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, জোরে হাসে এবং শব্দের দিকে মাথা ঘোরায়।

২০শ সপ্তাহ :

মাথা পুরোপুরি আয়ত্তাধীন।

নিপুণতা—ইচ্ছে করলেই কোনও বস্তুকে আঁকড়ে ধরতে পারে। খেলনা নিয়ে খেলতে পারে এবং কাগজ দুমড়িয়ে ফেলতে পারে।

বোঝার ক্ষমতা—খেলনা পড়ে গেলে সেটা কোথায় গেলো সেদিকে নজর রাখে।

২৪শ সপ্তাহ :

কোলে বা চেয়ারে বসতে পারে। আবর্তিত হতে পারে।

দাঁড়ানো অবস্থায়—নিজের পায়ে কিছু ওজন বহন করতে পারে।

নিপুণতা—পা দিয়ে খেলতে পারে ও দুধের বোতল ধরতে পারে।

বুঝতে সক্ষম—অপরিচিত লোক দেখলে লজ্জা পায় এবং খাওয়ার ব্যাপারে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে।

২৮শ সপ্তাহ :

দাঁড়ানো অবস্থায় ভালোভাবে পায়ের উপর ওজন বহন করতে পারে। আনন্দে লাফিয়ে উঠতে পারে।

নিপুণতা—এক হাত থেকে অপর হাতে বস্তু স্থানান্তরিত করতে পারে। বাজাতে পারে। সব বস্তুই মুখে দিতে পারে এবং নিজে বিস্কুট খেতে পারে।

কথাবার্তা—'দাদা', 'বাবা' ইত্যাদি স্বরবর্ণ ব্যবহার করতে পারে।

৩২শ সপ্তাহ :

সাহায্য ছাড়াই বসতে পারে।

বুঝতে সক্ষম—'না' বললে সাড়া দেয়।

৩৬শ সপ্তাহ :

আসবাবপত্র ধরে দাঁড়াতে পারে। আঙুলের সাহায্যে ছোট ছোট জিনিস তুলতে পারে।

৪০শ সপ্তাহ :

বসে থাকা এবং দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় নিজে টেনে টেনে চলতে পারে এবং হামাগুড়ি দিয়ে চলতে পারে।

নিপুণতা—খেলনা ছুঁড়ে ফেলতে পারে। অন্যের হাতে খেলনা দিতে পারে কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তা ছাড়বে না।

বুঝতে সক্ষম—অনুকরণ করে হাততালি দিতে পারে। টা, টা বলে হাত নাড়তে পারে।

নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়।

৪৮শ সপ্তাহ :

হাত ধরে হাঁটতে পারে।

নিপুণতা—খেলনা দেওয়া-নেওয়া করতে পারে। ইচ্ছে করে খেলনা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

বুঝতে সক্ষম—ছোট ছোট গান এবং প্রশ্ন যেমন "তোমার জুতো কোথায়" ইত্যাদি বুঝতে পারে। ছবির বই দেখতে পারে।

কথাবার্তা—এক থেকে তিনটি অর্থপূর্ণ শব্দ বলতে সক্ষম।

১৫শ মাসে :

সাহায্য ছাড়াই টলোমলো ভাবে চলতে পারে এবং হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি ওঠা-নামা করতে পারে।

নিপুণতা—দোতলা দুর্গ তৈরী করতে পারে।

বুঝতে সক্ষম—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কোনও বস্তু চাইতে পারে। না-সূচক শব্দ বলা শুরু হয়। প্যান্ট ভিজিয়ে ফেললে মাকে বলে।

১৮ মাসে :

একটা একটা করে সিঁড়ি বাইতে পারে, ছুটতে এবং লাফাতে পারে।

নিপুণতা—তিনতলা দুর্গ তৈরী করতে পারে। পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি লেখে ও জুতো খুলতে পারে।

বোঝাবার ক্ষমতা—ঘোড়া, কুকুর ইত্যাদি ছবির দিকে আঙুল দেখাতে পারে। নাক, চোখ ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলে দেখাতে পারে। ঝাঁট দেওয়া ও বাসন মাজা এ সমস্ত কাজে মাকে অনুকরণ করে। ছোট ছোট আদেশ পালন করে।

দুই বৎসর :

একটা একটা করে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করতে পারে।

নিপুণতা—ছ'তলা দুর্গ তৈরী করতে পারে। বইয়ের পাতা ওল্টাতে পারে। জুতো,মোজা, প্যান্ট পরতে পারে এবং হাত ধুতে ও মুছতে পারে।

বোঝবার ক্ষমতা—লম্বভাবে পেন্সিল দিয়ে দাগ কাটতে পারে। অন্যদের খেলার অনুকরণ করে নিজে খেলতে পারে।

কথাবার্তা—সর্বনাম করতে পারে, যেমন আমি, তুমি ইত্যাদি এবং অনর্গল কথা বলতে পারে।

আড়াই বৎসর :

প্রতি পদক্ষেপে একটা একটা পা দিয়ে সিঁড়ি উঠতে পারে। তিন চাকার সাইকেল চালাতে পারে।

নিপুণতা—জামাকাপড় পরতে এবং খুলতে পারে।

বোঝবার ক্ষমতা—বৃত্ত এবং মানুষ আঁকতে পারে। অবিরাম প্রশ্ন করে। ছোট ছোট ছড়া বলতে পারে, দশ পর্যন্ত গুণতে পারে এবং অন্যের সঙ্গে একত্রে খেলতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

শৈশবের সমস্যা

বদমেজাজ : আগের অধ্যায়ে দুই থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যকালীন সময়ে শিশুর না-ধর্মী (নেগেটিভিজম্) এবং অস্বীকার করার মনোভাবের কথা বলা হয়েছে। এই বয়সে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে সুরু করে। তখন তাদের প্রচুর বাড়তি শক্তি থাকে, সুতরাং সবসময় কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এ সময়ে অধিকাংশ শিশুকে কিছু করতে বললে 'করব না' ইত্যাদি না-বাচক বাক্যে সে কাজ করতে অস্বীকার করবে, উপরন্তু যা করতে তাকে নিষেধ করা হবে, তা-ই সে করবে। তখন তাকে জোর করলে সে প্রতিযোগী মনোভাব নেবে। সে এটাও উপলব্ধি করবে যে, মা, বা অন্যান্য বড়রা তার চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিযোগী এবং তার ক্ষমতা কম। এইভাবে শিশুর মনে হতাশা সৃষ্টি হবে, সে ধপ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়বে—লাথি ছুঁড়বে, আর্তনাদ করবে। প্রায় প্রত্যেক পিতামাতা এরকম ঘটনার সম্মুখীন হবেন। এ অবস্থায় শিশুকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে সেই অবস্থাতেই তাকে থাকতে দিতে হবে। কিছুক্ষণ বাদে শিশু নিজেই শান্ত হবার এবং সান্ত্বনা পাবার অবকাশ খুঁজবে। বড়দের তখন ক্রোধ প্রকাশ করলে ঘটনা আরও খারাপ হবে। কৌশলে তাকে সান্নিধ্য দিয়ে সান্ত্বনা দিতে হবে এবং অন্যদিকে তার মনঃসংযোগ করাতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় শিশুর মেজাজ গরম হয় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির অবকাশ না দেওয়া। বার বার শিশুকে হুকুম করা অনুচিত। যেমন 'জুতো পর' না বলে তার জুতো জোড়া এনে সোজা তাকে পরিয়ে দিতে হবে যাতে এ ব্যাপারে সে চিন্তা করার অবকাশ না পায়। আগাগোড়া শিশুর প্রতি স্নেহময় হতে হবে এবং সুচিন্তিত আচরণ করতে হবে। শিশুর মনে বিশ্বাস জোগাতে হবে। সে যেন অনুভব করে যে সে বড়দের সহকর্মী, আজ্ঞাবহ নয়। সে নিজের প্রেরণায় কাজ করছে।

বার বার বদমেজাজ প্রকাশ করলে বুঝতে হবে শিশুর শরীর ভাল নেই। অসুখের পর শিশুরা মেজাজী হয়। কারণ তখন

তারা দুর্বল ও খিটখিটে হয়। কিন্তু অনেক সময়ই তাদের বদমেজাজের জন্য পিতা মাতার আচরণ দায়ী হয়। তাঁদের বুঝতে হবে যে শিশুর অনেক ভাল ভাল খেলনাপাতি থাকলেও সাধারণ গৃহস্থালী বস্তু—যেমন থালা, বাটি, বাক্স প্রভৃতি তাদের প্রকৃত খেলনার চেয়ে বেশি প্রিয়। শিশুকে খুশী মেজাজে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, তার বাড়তি শক্তিকে কিছুর মধ্যে নিযুক্ত রাখার পরিস্থিতি তৈরী করতে হবে। যখন শিশু একগুঁয়েমি করবে, তখন তার সঙ্গে বিরোধীর ভূমিকা এড়াতে হবে। তার মন অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে একা থাকতে দেওয়া ভাল। বিরূপ আচরণ করে সত্যিকারের সমস্যা সৃষ্টি না করলে শিশুর অবাধ্য মনোভাবের পর্ব ক্রমশ দূর হয়ে যাবে।

তোতলামি : দুই থেকে চার বছর বয়সকে কথা বলার অনর্গলতার অভাবের বয়স বলা হয়। এই সময়ে শিশুর অনেক কথা বলার থাকে, কথা সে তাড়াহুড়া করে বলে ফেলতে চায়, অথচ ভাষার উপর যথেষ্ট অধিকার থাকে না। তখন তার নতুন নতুন ক্ষমতা অর্জন করার বয়স। তাই কথা বলার নৈপুণ্যের দিকে মনোযোগ কম দেয়। ওদিকে আবার সে মনের সব কথা বড়দের, মাকে বলার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে থাকে, অথচ বড়দের অত সময় ও ধৈর্য থাকে না বেশীক্ষণ ধরে শিশুর অনর্গল কথা শোনার। একদিকে তার মনের কথা ব্যক্ত করার প্রবল ঝোঁক, অপরদিকে কথা বলার অপটুত্ব, আবার বড়দের তার কথা শোনার অনীহা বা অনবকাশ—সব মিলিয়ে শিশুর আবেগে আঘাত লাগে এবং সে তোতলাতে থাকে। তবে সান্ত্বনা এই যে অধিকাংশ শিশু এই পর্বে কথা অনর্গল বলতে শেখে। এই পর্ব তার বিকাশের স্বাভাবিক একটা পর্যায়। সংশোধন করে দিয়ে তাকে সচেতন করে তোলা অনুচিত। বরঞ্চ তার কথা ধৈর্য ধরে শোনা এবং তাকে কথা বলতে সময় দেওয়া উচিত।

তোতলামির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিশুর আবেগ। শিশু যদি কোনও কারণে অনিরাপদ বোধ করে, তবে তোতলামি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। কোনও শিশুর তোতলামি বন্ধ হবার পর তার আবেগের চাপ সৃষ্টি হলে আবার সে তোতলাতে শুরু করতে পারে। যেমন—বাসস্থান পরিবর্তন, নতুন পরিবেশে

প্রবেশ, নিকট আত্মীয়দের অনুপস্থিতি বা নতুন শিশুর আগমন এই জাতীয় ঘটনা শিশুর আবেগকে আঘাত দেয়। আপাতদৃষ্টিতে শিশুর মনে হিংসার ভাব দেখা দেখা না গেলেও তার মনের যে কোন প্রকারের অনিরাপদবোধের বহিঃপ্রকাশ হয় তোতলামির মধ্য দিয়ে। ছেলেদের মধ্যে তোতলামি অনেক বেশি দেখা যায় এবং যে সব পরিবারের অন্য কেউ তোতলায়, সেই পরিবারের শিশুর তোতলা হবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা যায়—ন্যাটা শিশুকে ডান হাতে কাজ করতে শেখালে তার তোতলাবার প্রবণতা জেগে ওঠে।

বামাবর্তিতা (ন্যাটা হওয়া): বেশীর ভাগ শিশু প্রথম বা দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত দুটি হাতই সমান ব্যবহার করে থাকে। ঐ ক্রমে সে হয় বাঁ হাতে নয় ডান হাতে কাজ করতে পছন্দ করে। কেউ কেউ অবশ্য প্রথম থেকেই বাঁ হাত ব্যবহার করে থাকে। আবার কোন কোন শিশু প্রথমে একটা হাত ব্যবহার করতে করতে নিজে থেকেই অপর হাত ব্যবহার করতে সুরু করে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন এটা শুধু ট্রেনিং-এর ব্যাপার। অপর অনেকে মনে করেন যে জন্মাবধি একদিকের ব্রেনের অপর দিকের ব্রেনের উপর প্রাধান্যের ফলে এইরূপ হয়। সুতরাং যদি কোন শিশু ডান হাত অপেক্ষা বাঁ হাতের ব্যবহার বেশি করে অথবা দুই হাতই সমান ভাবে ব্যবহার করে, তবে তার ডান হাতের কাছে খেলনা প্রভৃতি দিয়ে ডান হাতের ব্যবহার করতে সাহায্য করা উচিত। অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা—এই বাঁ হাত—ডান হাতের ব্যাপারের জন্য শিশুরা পরে তোতলাতে সুরু করে। ন্যাটারা কিছু অপটু নয়, কর্মক্ষেত্রের প্রতিযোগিতায় তারা পিছিয়েও পড়ে নেই। অধিকাংশ ন্যাটা লোক বাঁ হাতে লেখেন এবং সূক্ষ্ম কাজ করার সময় বাঁ হাত ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁদের ডান হাতও কাজ করার উপযুক্ত।

বিছানায় প্রস্রাব করা: ১৫—১৮ মাস বয়সের বেশীর ভাগ শিশু দিনে প্রস্রাবের বেগ সামলাতে পারে। রাত্রে প্রস্রাবের বেগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হয় সাধারণত দুই থেকে তিন বছর বয়সে। কোন কোন শিশু ৫-৬ বছর বয়সেও বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে, তারা যদি অধিকাংশ রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব না করে মাঝে মধ্যে করে ফেলে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কেননা অত্যধিক শ্রান্তি বা উত্তেজনার জন্য সেরকম হয়ে থাকে।

ছেলেরাই বিছানায় প্রস্রাব বেশি করে। তার অনেক কারণ আছে। প্রথমত অতি অল্প বয়সে অথবা কঠোর ভাবে মলত্যাগের বিধিনিষেধ অনুশীলন করানো ঠিক নয়। অতি অল্প বয়সের শিশুদের এই অনুশীলন ভালভাবে বোধগম্য হয় না। সেইজন্য দেড় থেকে দুই বছরের আগে কঠোরভাবে মলত্যাগের বিধিনিষেধ আরোপ করলে শিশুরা তা গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত শিশুদের মানসিক একটা দিকও এর সঙ্গে জড়িত আছে। দেখা যায় —বিছানায় প্রস্রাব করে যে শিশুরা তাদের প্রায়ই মানসিক সমস্যা রয়েছে। হয় তাদের মধ্যে একটা অনিরাপদবোধ কাজ করছে, অথবা তাদের মা হয় তো সর্বদাই শিশুকে শাসনে রাখতে চায় ইত্যাদি। প্রস্রাব করার সমস্যা সম্পর্কে শিশুকে বেশী সচেতন করে তুললে সমস্যা আরও রেড়ে যাবে এবং শিশু আরও উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত হয়ে পড়বে। বিছানা ভিজিয়ে ফেললে তাকে কখনও ভর্ৎসনা করা উচিত নয়। সে নিজেই এর জন্য লজ্জিত, এর জন্য তাকে ভয় দেখালে বা ক্ষ্যাপালে সমস্যা কঠিনতর হবে। বিছানায় প্রস্রাব করলে যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব প্রকাশ করতে হবে। অন্যদিকে, যেদিন সে বিছানা ভেজাবেনা, সেদিন খুব প্রশংসা করতে হবে। এতে শিশুর বিশ্বাস আসবে যে বিছানায় প্রস্রাব না করাও তার অসাধ্য নয়। এরজন্য মায়ের উচিত একটি ডায়েরী শিশুকে দেওয়া এবং তাতে যেদিন সে বিছানায় রাত্রে প্রস্রাব করবে না, সেই দিনটির তারিখ একটি তারকা চিহ্নে নির্দিষ্ট করা। শিশুকে বলতে হবে যে এক সপ্তাহে কয়েকটি তারকাচিহ্ন লাভ করলে সে তার ইচ্ছানুযায়ী একটা পুরস্কার পাবে। তাতে সে উৎসাহিত হয়ে যে সংগ্রাম করবে, তাতে দুই পক্ষেরই উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

কোন কোন শিশু আবার রোজ রাত্রে বিছানা ভেজায় না, তারা মাঝে মধ্যে প্রস্রাব করে ফেলে। সেক্ষেত্রে শিশুর আকস্মিক মানসিক উদ্বেগ, অনিরাপদবোধ বা হতাশার কোন কারণ ঘটে থাকে। যেমন, পিতা বা মাতা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ায়, পরিবেশের পরিবর্তনে অথবা নতুন শিশুর আগমনে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে--শিশুর মধ্যে হিংসা নেই—কিন্তু সে হঠাৎ অনুভব করলো সে তার মা'র ভালবাসা হারিয়েছে। তখন সে অচেতন মনে আবার ছোট শিশু হয়ে যেতে চায় এবং প্রস্রাব করে। এইভাবে শিশুর মানসিক অশান্তি

বা অনিরাপত্তার কারণ অনুধাবন করতে পারলে তার অভ্যাসের সংশোধন সহজ হয়।

কোন কোন শিশুর কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই প্রস্রাবের থলি (ব্লাডার) ছোট থাকে। সে সব ক্ষেত্রে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে যতক্ষণ সম্ভব প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে এবং এভাবে প্রস্রাবের থলির আকার বেড়ে যাবে। প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস করার ফলে রাত্রে বিছানাও ভিজাবে না। সন্ধ্যার দিকে জলীয় পদার্থ কম খাওয়ালেও প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।

দেখা যাবে ঘুমের মধ্যে শিশু মলদ্বার চুলকায়। কখনও দেখা যায় রাত্রে শিশুর মলদ্বারে সুতোর মত কৃমি জড়ো হয়। তার জন্যও বিছানায় প্রস্রাব করে। সেক্ষেত্রে গুড়ো কৃমির চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। এইসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা খুবই সহজ এবং আপনি কৃমির জন্য আপনার চিকিৎসকের উপদেশ নেবেন।

কিছু কিছু ওষুধ আছে যা প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও ফলপ্রদ উপায় হচ্ছে প্রস্রাবের কার্যকারণ নির্ধারণ করা এবং তা আয়ত্বে আনা। শিশু যদি দিনের বেলাতেও প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তবে তা শরীরের আভ্যন্তরীণ কোনও অসুবিধার জন্য হতে পারে। তাহলে তাকে চিকিৎসক দেখানো দরকার।

বুড়ো আঙুল চোষা: সাধারণত তিন মাস বয়স থেকে শিশু বুড়ো আঙুল চুষতে থাকে। এই বয়সে তার প্রধান প্রবৃত্তি হল কিছু চোষা। এর আগে শিশু এত ছোট থাকে যে নিজে আঙুল তুলে মুখে পুরতে পারে না। শিশু হাত এদিক ওদিক ছুঁড়তে থাকে, এমনি করতে করতে যদি হঠাৎ তার বুড়ো আঙুল বা মুঠো মুখে গিয়ে পড়ে অমনি সে তা আনন্দে চুষতে সুরু করবে যতক্ষণ না মুখ থেকে হাত সরে যাবে। ৩—৪ মাস বয়সে শিশু যদি বুড়ো আঙুল চুষতে আরম্ভ করে, তার অর্থ সে যথেষ্ট চোষার সুযোগ পায় না। শিশুর এই অভাব প্রথম অবস্থাতেই পূরণ করা উচিত। অন্যথায় এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। শিশু যদি বুকের দুধ খায়, তবে দুধ খাওয়া হয়ে গেলেও তাকে দুধ চুষতে দেওয়া কর্তব্য। বোতলের দুধ খেলে তার নিপ্‌ল এর ফুটো অপেক্ষাকৃত সরু করতে হবে যাতে অনেকক্ষণ ধরে চুষে দুধটা পান করতে পারে। সবচেয়ে

সহজ উপায় হচ্ছে শিশুকে চুষিকাঠি চুষতে দেওয়া। এটা সে প্রাণ ভরে চুষতে পারবে। তবে চুষিকাঠি বোতলের নিপ্‌লের মতই পরিষ্কার রাখতে হবে। কখনও বোতলের খালি নিপ্‌ল শিশুকে চুষতে দিতে নেই। আমি দেখেছি কিছু মায়েরা বাচ্চাকে শান্ত রাখতে কেবলমাত্র নিপ্‌লটা চুষতে দেন। বোতলের নিপ্‌লের ফুটো থাকে। শিশু যখন খালি নিপ্‌ল চোষে, তখন প্রত্যেকবারের চোষায় সে হাওয়া গিলে ফেলে। তাতে তার পেট ফেঁপে ওঠে এবং ব্যথা হয়। অন্যদিকে, কিছু কিছু চুষিকাঠিতে মিষ্টি তরল পদার্থ থাকে। সেই চুষিকাঠি কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ কেউ জানে না ঐ মিষ্টি তরল পদার্থটির উপাদান কি। শিশু চায় কেবল চুষতে। সুতরাং ফুটোশূন্য চুষিকাঠিই তার পক্ষে যথেষ্ট। অনেকে চুষিকাঠি ব্যবহার করতে ভয় পান। এবং চুষিকাঠি ব্যবহার করলে সমালোচনা করেন। এর কারণ এই যে, শিশু চুষি চুষতে চুষতে ফেলে দেয়, তা কাছাকাছি পড়ে থাকে এবং তাতে মাছি বসতে পারে এবং অন্যভাবেও নোংরা হতে পারে। এর ফলে রোগ সংক্রমণ ঘটতে পারে। তাই চুষিকাঠি সবসময় পরিষ্কার করতে হবে। সম্ভব হলে তা ফুটিয়ে রাখতে হবে এবং যখন ব্যবহার করবে না তখন ঢাকনাযুক্ত পাত্রে রাখতে হবে। শিশুরা নিজে থেকেই চুষি চোষা বন্ধ করে। বিশেষ করে যে সব শিশুর চোষার চাহিদা ঠিকমত পূরণ হয়নি কেবল তাদের প্রয়োজন মেটাতেই যথাসময়ে চুষি চুষতে দেওয়া হয়, কোনরকম আনন্দের জন্য নয়, সেইজন্য এই সব শিশু চোষার অভাব পূরণ হলেই চুষি ত্যাগ করবে।

অধিকাংশ শিশুর চোষার প্রবৃত্তি তাদের ছয় মাস বয়স হলে আর থাকে না। যদি তাদের চোষার বাসনা পূর্ণ না হয়, তাহলে তারা বুড়ো আঙুল চুষতে থাকবে। শেষে বুড়ো আঙুল চোষায় তারা আরাম পাবে এবং এটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। ছয় মাস বয়সে বাচ্চারা স্বাধীন হতে আরম্ভ করে। প্রায়ই সে কোলে বসে দুধ খেতে চাইবে, দুধের বোতলটাও নিজে ধরতে চেষ্টা করবে। যখন সে ক্লান্ত বা বিরক্ত হয়, তখন সে আবার তার শিশুদিনের আরামে ফিরে যায়। এই সময়টাতে শিশুরা আরাম ও সান্ত্বনা পাবার জন্য বা ঘুমিয়ে পড়বার জন্য বুড়ো আঙুল চোষে।

শিশুরা যখন ৬—১২ মাসের বয়স, তখন যদি সে অন্য সব

বিষয়ে স্বাভাবিক থাকে, কেবল ঘুমোবার সময় বুড়ো আঙুল চোষে, তবে আপনার করার কিছু নেই। কিন্তু যে শিশু জেগে থাকার সময়ও আঙুল চোষে, তার জন্য চিন্তা করতে হবে কেন সে আঙুল চোষে। তাকে কি অনেকক্ষণ একা ফেলে রাখা হয়? তার কি যথেষ্ট খেলনা আছে? অথবা অন্যেরা তাকে যথেষ্ট সঙ্গ দেয় না? কিছু বয়স্ক শিশু আছে যারা স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা থাকলেও খেলায় যোগদান করতে পারে না তখন তারা একধারে দাঁড়িয়ে লজ্জায় আঙুল চুষতে থাকে। এরকম অবস্থায় তার মনে বিশ্বাস অর্জন করাতে সাহায্য করতে হবে এবং তার লজ্জা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

অবাঞ্ছিত আঙুল চোষা বন্ধ করার জন্য হাতে ন্যাকড়া জড়িয়ে দেওয়া বা বুড়ো আঙুলে তেতো ওষুধ লাগানো ঠিক নয়। তাতে তার হতাশা আরও বাড়বে, ফলে গোঁয়ার্তুমি করে আরও আঙুল চুষবে। সুতরাং এ সব না করে শিশুর মনকে অন্য বিষয়ে প্রবাহিত করার চেষ্টা করতে হবে, তাকে মজার খেলনা বা খেলা দিয়ে মগ্ন রাখতে হবে। খুব ছোট শিশুকে অবশ্য এভাবে লোভ দেখিয়ে কোন লাভ হয় না। কিন্তু ২—৩ বছরের শিশু এরকম খেলনা বা খেলার আরাম ও লোভ সামলাতে পারে না। আঙুল চোষার কথা শিশুকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাতে তার মন আরও বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। বরঞ্চ তাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে এই বলে যে সে এখন কত বড় হয়েছে সে এখন অন্যান্য বড়দের মত হবে, আর আঙুল চুষবে না ইত্যাদি।

অল্প বয়সে আঙুল চোষায় স্থায়ী দাঁতের ক্ষতি করবে না। কারণ স্থায়ী দাঁত বছর ছয়ের সময় ওঠে, প্রায় সব শিশুরই তখন আঙুল চোষাও বন্ধ করে।

শিশুদের খাওয়াবার সমস্যা :

সব পিতামাতাদের একটা সাধারণ সমস্যা হচ্ছে—তাঁদের শিশু তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী খাচ্ছে না। প্রথমেই জানতে হবে এই সমস্যা কি প্রকৃত না কাল্পনিক? সু-আহারী এবং অতিরিক্ত ওজনের শিশুদের পিতামাতা আবার এ ধরণের অভিযোগ বেশী করে থাকেন যে তাঁদের শিশু কিছুই খায় না। শিশুর ওজন যদি বয়স অনুপাতে

স্বাভাবিক থাকে, তবে নিশ্চয়ই সে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে। যদি চিকিৎসক বাচ্চার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে আপনাকে এই আশ্বাস দেন যে, তার ক্রমবৃদ্ধি স্বাভাবিক, তখন বাচ্চাকে আরও বেশী খাওয়াতে চাওয়া অযৌক্তিক হবে। দ্বিতীয়ত নানা কারণে শিশু প্রকৃতই কম খেতে চাইতে পারে।

বেশী খিদে এবং কম খিদের ব্যাপার অবশ্যই একটা আছে। বড়দের মতই কোনও কোনও শিশুও সর্বদা খাবারের অপেক্ষায় থাকবে এবং বেশ পরিমাণে খাবে। পক্ষান্তরে অনেক শিশু আছে যারা স্বাস্থ্যবান ও স্বাভাবিক। অথচ খায় খুব কম। এরা ক্লান্ত হলে বা অসুস্থ হলে অনায়াসে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। কিন্তু প্রত্যেক শিশুকেই নিজে নিজে খেতে দিলে তারা যথেষ্ট খেতে বাধ্য। কারণ, বড় পরিবারে, যেখানে ব্যক্তিগত আদর যত্নের সময় কম থাকে, অথবা দরিদ্র পরিবার যেখানে খেতে পেলেই যতটা পাবে খেয়ে নেয়, এরকম পরিবারের শিশুরা নিজেরা খায় বলে আপনমনে বেশ অনেকখানি খায়। সুতরাং না খাওয়া বা কম খাওয়ার সমস্যাটা আসে পিতা-মাতার অতি উদ্বিগ্নতার দরুণ শিশুকে চাপ দিয়ে তার ইচ্ছার বাইরে, অসময়ে অথবা অপ্রয়োজনে খাওয়াবার ফলে। এরই জন্য তার খাদ্যে অনীহা জন্মায়? এই অনীহার সূত্রপাত হয় মা যখন শিশুকে আর এক আউন্স বেশী দুধ ঝিনুকে করে খাওয়াতে চেষ্টা করেন, সেই সময় থেকেই। জোর করে ঐ এক আউন্স বা এক ঝিনুক বেশী দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করার অর্থ শিশুর খেতে না চাওয়া এবং মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এভাবেই ক্রমে শিশু খাওয়ানোর সময় বাধা প্রদান করবে, এমনকি খেতে ভয় পেতেও সুরু করতে পারে। জোর করে খাওয়ানোর পরে শিশু বমি করলে ক্রমে সে খাওয়া এড়াতে চাইবে। শিশুকে জোর করে খাওয়ানোর এই পর্বেই মা যদি ঘটনা উপলব্ধি করতে পেরে প্রয়োজনীয় আত্মসংযম এবং নিয়মানুবর্তিতা সহকারে শিশুকে জোর করে না খাইয়ে তার ইচ্ছানুযায়ী খাইয়ে ছেড়ে দেন, তবে পরের বারের খাওয়ার জন্য তাঁর শিশুও অপেক্ষা করবে। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, এতে শিশুর খিদে পাবে, পূর্বেকার কম খাওয়ার অভাব পূরণ করবে। একবার খেতে গিয়ে যদি শিশু বোতলের দুধ শেষ করতে না পারে, তাকে আধ ঘণ্টা পরেই আবার খাওয়াবার চেষ্টা করা অনুচিত। স্বাস্থ্যবান

শিশু হলে একবারের কম খাওয়ার তার বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় কিছু ব্যাঘাত ঘটবে না। কিন্তু এই সময়ে খাওয়ানোর বিরুদ্ধে শিশুকে যুদ্ধ করতে হলে অশেষ সমস্যার সূত্রপাত হতে পারে।

প্রায়ই কোনও অসুখ বিসুখের পর শিশুর খাওয়ার সমস্যা আরম্ভ হয়। যে কোন অসুখ—বিশেষ করে বিশ্রী ভাবে ঠাণ্ডা লাগলে কিছু দিনের জন্য শিশুর খাদ্যে অনিচ্ছা হয়। তখন ধীরে ধীরে খিদে ফিরে পেতে তাকে অবকাশ দিতে হবে। তবেই সে খুব তাড়াতাড়ি ঘাটতি খাওয়া পূরণ করে ফেলবে। কিন্তু শিশুর যদি দীর্ঘদিন খাবার অনিচ্ছা থাকে, আর তাকে যদি সেই বিমুখ অবস্থাতেই জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা হয়, তবে খাবার ইচ্ছা না বেড়ে খেতে অনিচ্ছাটাই দীর্ঘায়িত হবে। সুতরাং শিশু খেতে না চাইলে খাওয়াবার প্রয়াস না চালিয়ে শিশুর খাওয়ার আকাঙ্খাকে তৈরী করতে হবে। তাকে ক্রমাগত খাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা বা তার খাওয়ার ব্যাপারে মায়ের উদ্বিগ্ন হওয়া কখনই উচিত নয়। অসুখের পর খিদে ফিরে পেতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে। এরই মধ্যে শিশুকে খেতে চাপ দেওয়া বা তার কম খাওয়ার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলে পুনরায় সমস্যার গোড়ায় ফিরে যেতে হবে। শিশু যা খেতে সবচেয়ে ভালবাসে, সেটা খেতে দিয়ে খাওয়ার ইচ্ছা ফেরাতে সাহায্য করতে হবে। শিশুরা সাধারণত ভাতের বদলে ডিম, কলা, রুটি ও আলু খেতে পছন্দ করে। অথবা হয়তো সে তার নিজের খাদ্যের চেয়ে তার বাবার খাদ্যই বেশী পছন্দ করল, তাকে কিছুটা সেই খাবার দেওয়া যেতে পারে। একটুকরো মসলা মাখান খাবার দিলেও ক্ষতি হবে না, কিন্তু দুটো খাবারের মধ্যবর্তী সময়ে বিস্কুট বা চানাচুর জাতীয় খাবার দেওয়া ঠিক নয়। সেগুলো খেলে পরে আর সম্ভবত সে খেতে পারবে না।

শিশুর খাদ্যবস্তুর মধ্যে কয়েকটা জিনিস খেতে না চাইলে সে খাবার তাকে মাস দুই খেতে না দেওয়াই ভাল। সাধারণত শিশুরা দুধ এবং ভাত খেতে পছন্দ করে না। সেক্ষেত্রে দুধ দিয়ে দই বা পায়েস করে খেতে দিলে পুষ্টি সমানভাবেই জোগাবে। অথবা সামান্য চা মিশিয়ে দুধ দিলে শিশুরা সেটা খেতে চাইবে। ভাত দেওয়া দু-এক মাস নির্বিঘ্নে বাদ দেওয়া যায়—তারপর শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে অল্প করে ভাত দিতে আরম্ভ করতে হবে।

তখনও যদি ভাত না খেতে চায়, আপাততঃ বন্ধ রেখে পরে আবার চেষ্টা করতে হবে।

কম ওজনের শিশু : এটাও পিতামাতার একটা চিরসমস্যা। তাঁদের চোখে তাঁদের শিশু বড় রোগা। রোগা হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। পিতামাতা খাটো দেহী হলে বাচ্চা ব্যতিক্রম হবে আশা করা যায় না। দেখতে হবে শিশু সক্রিয় এবং স্বাস্থ্যবান কি না যদিও সে বড় আকৃতির শিশুর থেকে কম খায়। শিশু নিজস্ব ধরনে ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত আছে কিনা, তাও লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রকৃতপক্ষেই কম খাওয়ার জন্য রোগা শিশুও আছে। শৈশবে খাওয়ানোর ব্যাপারে অদ্ভুত সমস্যা থেকে এই কম খাওয়ার সূত্রপাত হতে পারে। এর আগেই কম খাওয়ার সমস্যার কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই অনুসারে এই সমস্যার সমাধান করা কর্তব্য।

কিছু সংখ্যক শিশু আছে,—এদের প্রকৃতপক্ষে খাওয়ার কোন সমস্যা থাকে না। তাদের খিদেই কম থাকে। এই ব্যাপার বড়দের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সুতরাং একই পদ্ধতি গ্রহণীয়। কম খিদের শিশুদের অল্প পরিমাণেই কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া উচিত। ভাজা খাবার খেতে দেওয়া উচিত নয়। তাতে খিদে মরে যায়। জলখাবার হিসাবে বিস্কুট জাতীয় খাবার দেওয়া বন্ধ করতে হবে। এতে কোনও পুষ্টিমূল্য নেই। শিশু যেহেতু একেবারে অনেকটা খেতে পারে না, সেইজন্য তাকে কলা, ছানা, রুটি, মাখন ইত্যাদি পুষ্টিকর খাবার দুটি প্রধান খাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে দিলে তার দেহের পুষ্টি জোগাতে সাহায্য করবে।

কোনও কোনও শিশু রোগা হয় তার অত্যধিক চঞ্চলতার জন্য। এই ধরনের শিশুরা কখনও শান্ত থাকে না। এদের দেহে বেশী ওজন আশা করা যায় না। অথচ তারা স্বাভাবিক খায়, তাদের স্বাস্থ্যও ভাল সুতরাং এদের জন্য চিন্তার কারণ নেই।

অসুখ-বিসুখের জন্য শিশুর সাময়িক ওজন কমলে প্রথমেই তার পেটে খিদে ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে হবে। অনিচ্ছায় জোর করে খাইয়ে ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করা কখনই উচিত নয়। অসুখের জন্য ওষুধপত্র খেয়ে শিশুর খিদে নষ্ট হয়, এমনকি তার বমি বমি ভাব থাকে। সুতরাং এ অবস্থা কাটিয়ে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায়

ফিরে আসতে দিতে হবে। স্বাভাবিক হলে সে হৃত ওজন ফিরে পাবে।

এ সবের পরও যদি শিশু কম ওজনের হয়, তাকে যদি ক্লান্ত-স্তিমিত দেখায় এবং সে যদি খিদে ও শক্তি হারায়, তবে তাকে চিকিৎসক দেখিয়ে পরীক্ষা করা দরকার।

অতিরিক্ত ওজনের শিশু :

শিশু অতিরিক্ত ওজনের হলে ভারতীয় পিতামাতাগণ বিশেষ সমস্যা বোধ করেন না। তাঁরা বরঞ্চ মোটা শিশুর জন্য গর্ব বোধ করেন যে কত ভালভাবে তাঁদের শিশুকে লালন-পালন করছেন। চিকিৎসকগণ কিন্তু অন্যরকম ভাবেন। বর্তমানে চিকিৎসকগণ অনুভব করছেন, শিশু তার জীবনের প্রথম কয়েক বছরে অতিরিক্ত ওজনসম্পন্ন হলে তার প্রকৃত মেদকোষগুলি বাড়বে। সেই মেদকোষ-গুলি বৃদ্ধির জন্য শিশু সবসময় প্রয়োজনাতিরিক্ত খাবে। প্রাপ্ত-বয়স্ক হলে সে স্থূল চেহারার হবে এবং ভবিষ্যতে এদের উচ্চ রক্তের চাপ ও ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং শিশুর ওজন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে শৈশবই তা সংশোধন ও প্রতিকার করার সর্বোৎকৃষ্ট সময়। মেদবর্ধক খাদ্য যেমন মিষ্টি, সিরিয়াল (দানাজাতীয় খাদ্য), ভাত, আলু এবং স্নেহজাতীয় খাদ্য মাখন, ঘী ইত্যাদি স্থূল শিশুকে কম দিতে হবে। তাকে দুধ, মাছ, যথেষ্ট ফল এবং সবজী ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে। এসব তার খিদে মেটাবে, অথচ মেদ ও ওজন বাড়াবে না।

বড় শিশুদের বেশি পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য খেলেই প্রয়োজনাতি-রিক্ত ওজন হয়। কারণ এরা খুব কম দৈহিক পরিশ্রম করে। স্থূলদেহী শিশুরা অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে লজ্জা পায়। ফলে তাদের সক্রিয়তা কমে। তারা কম খেলাধুলা করার ফলে ঘরেই বেশীক্ষণ কাটায় এবং নিজেদের সান্ত্বনা দেবার জন্য সর্বদা খায়। পিতামাতার উচিত তারা বাইরে অপর শিশুদের সঙ্গে যাতে খেলে তার জন্য সাহায্য করা। মেদবর্ধক খাদ্য স্থূল ও অতিরিক্ত ওজনের শিশুদের মোটেই দেওয়া উচিত নয়। সেইজন্য বিস্কুট বা জলখাবারের টুকটাক খাদ্য বাড়িতে না রাখাই ভাল। কারণ ওই

খাবারগুলো দেখে তারা লোভ সামলাতে পারবে না, যখন খিদে পাবে তখন কাঁচা শশা, কাঁচা টম্যাটো এবং ঢ্যাঁড়শ প্রভৃতি স্যালাড অল্প পরিমাণে খেতে দিতে হবে। সে সব বিষয়ে তারা আগ্রহী, সে সমস্ত বিষয়ের দিকে তাদের মনকে আকৃষ্ট করাতে হবে যাতে সর্বদা খাওয়ার কথা ভুলে যায়। তাদের খাদ্য থেকে চিনি, ভাত, আলু, ঘী এবং মাখন বর্জন করে প্রোটিনযুক্ত খাদ্য ও শাক-সবজী খেতে দিতে হবে। বয়ঃসন্ধির আগে পর্যন্ত ৮ থেকে ১৩ বছর বয়স্ক বহু ছেলেমেয়ের ওজন স্বাভাবিক ভাবেই একটু বেশী হয়। বেশী ওজনের জন্য চিন্তিত হওয়া বা সে বিষয়ে খুব বেশী মনঃসংযোগ করার কোন প্রয়োজন নেই। সমবয়স্ক অন্যান্য শিশুদের অপেক্ষা স্থূল শিশুরা হয়তো আরও বেশী আত্মসচেতন হয়। স্বভাবতই তারা লম্বা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অতিরিক্ত ওজনও হবে।

অষ্টম অধ্যায়

আচরণগত সমস্যা

স্বার্থপরতা : দুই থেকে আড়াই বছর বয়স্ক স্বাভাবিক শিশুরা নিজেদের মনেই নিজেরা খেলে। পছন্দমতো খেলনা তারা দখল করে নেবে। এই বয়সের শিশুরা সমবয়স্কদের সঙ্গে মিশে খেলবে আশা করা যায় না। এই সময়ে তাদের সঞ্চিত ও দখলীকৃত জিনিস-পত্র ত্যাগ করার জন্য জোর করলে বিপরীত ফল হবে—আরও মরিয়া হয়ে তারা তাদের সম্পত্তি রক্ষা করবে, কাউকে তা দেবে না, দিতে বললে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেবে। এই বয়সেই তাকে অন্যকে কিছু দিতে শেখাতে হবে। নিজের অংশ শিশুকে দিয়ে, তাকেও দিতে শেখানো ভাল পদ্ধতি। যাঁরা আদান-প্রদান করেন, তাঁদের মধ্যে পালিত শিশু দিতে ও নিতে শেখে। দুই তিন বছরের কোনও শিশু অন্যান্য শিশুদের খেলনা কেড়ে নিতে চাইলে তাকে সেই সব শিশুদের সঙ্গে খেলতে দিতে হবে, যারা এরকম করে না, যারা দিতে চায়। তখন সেই শিশুও মাঝে মাঝে তার খেলনা অন্যকে দিয়ে খেলতে চাইবে। তিন বছরের শিশু সাধারণত অন্যদের সঙ্গে মিশে খেলতে শেখে। বাচ্চাদের খেলায় বেশি হস্তক্ষেপ করা উচিত না। দুর্ভাগ্যবশত কিছু মা আছেন, যাঁরা নিজের বাচ্চার অধিকার নিয়ে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু শিশুদের এটাই শেখাতে হবে যে তাদের সকলের সঙ্গে মিশে থাকতে হবে, পিতামাতা তাদের সবসময় আগলে-আগলে রাখবে না।

সাধারণত পরিবারের প্রথম শিশুর অন্যান্যদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে থাকার ব্যাপারেই সমস্যা দেখা দেয়। অবশিষ্ট শিশুদের বেলায় ততটা সমস্যা আসে না। কারণ আগ্রহী ও উৎসুক পিতামাতারা সুরু থেকেই তাঁদের প্রথম সন্তানকে নিয়ে হৈ চৈ করেন, ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা অনবরত শিশুর সান্নিধ্যে থেকে খেলা দেন, শিশুকে নিজে নিজে খেলতে শেখান না। প্রায়ই তাঁরা তাঁদের শিশুকে অন্য-দের সামনে জাহির করতেও চান। এর অর্থ কিছুটা না হয় বোঝা

যায়। কিন্তু সেই শিশু যখন বড় হয়ে উপলব্ধি করবে যে সে-ই সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এবং সব আদরের ভাগী, তখন আর সে তার সেই অধিকার ছেড়ে দিতে একটুও পছন্দ করবে না, তা হলে দেখা গেল সেই শিশু না শিখল স্ব-নির্ভর হতে, না শিখল নিজেকে খুশী করতে। অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয় তার চিত্তবিনোদনের জন্য। অপরদিকে সে বড়ই হয় এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে যে সে-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সে দিক দিয়ে চিন্তা করলে তাকে বড় বঞ্চিত শিশু বলে মনে হয়। সুতরাং সুরু থেকে শিশুর দিকে অতিরিক্ত নজর না দিয়ে তাকে স্বনির্ভর হতে শেখানো উচিত এবং বুঝতে দেওয়া উচিত যে শিশুর ইচ্ছা মত সবসময় সব কিছু চলবে না।

হিংসা : কিছু পরিমাণ হিংসা প্রত্যেক শিশুর মধ্যে থাকাটাই স্বাভাবিক যেমন থাকে বড়দের মধ্যে। তবে বড়দের সেই ভাবটা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকে। তাঁরা যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে সেটাকে বিবেচনা করতেও পারেন, কিন্তু বাচ্চাদের হিংসা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে হয়। শিশুরা হিংসার অনুভূতিকে যুক্তি দিয়ে ঢেকে রাখতে পারে না, সেইজন্যই তাকে বুঝতে সাহায্য করতে হবে যে এরকম হিংসা করার কোন যুক্তি নেই, এবং তাদের সেই অনুভূতিকে গঠনাত্মক আচরণে পরিবর্তিত করতে হয়।

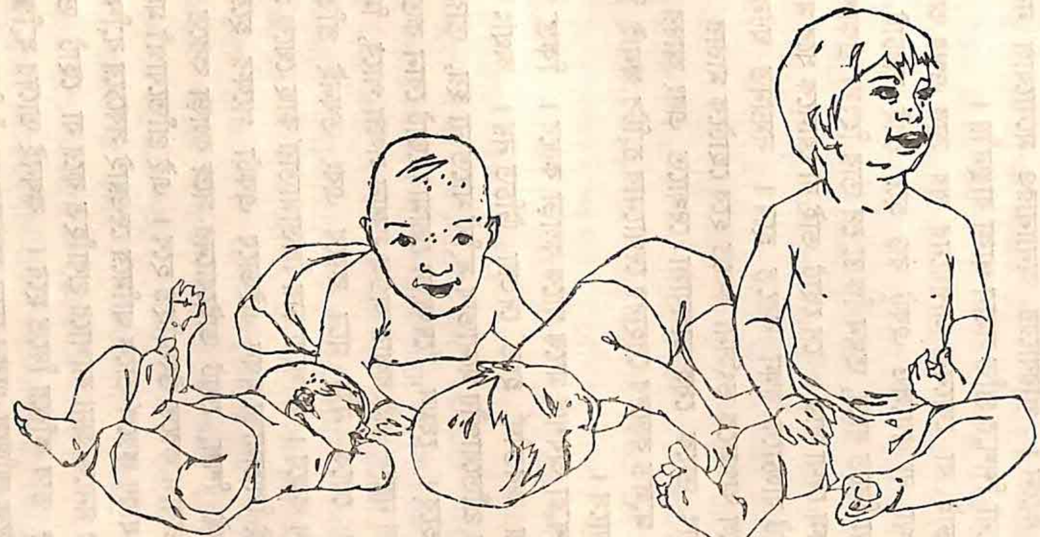
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শিশুর আগমনে এই সমস্যার উদ্ভব হয়। বিশেষ করে প্রথম শিশু যদি দুই বছরের বেশী বয়সের হয়, তবে হিংসা নবাগতকে কেন্দ্র করে আসতে চায়। এতদিন পর্যন্ত পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসা-যত্ন দেখাশুনা সব তাকে কেন্দ্র করে ছিল। হঠাৎ তার থেকে অনেক ছোট এবং অসহায় একটা জীবন তাকেই দেওয়া এতদিনের স্নেহ-মায়া-মমতার অংশীদার হয়ে গেল— এটা তার মত ছোট শিশুর পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তখন সে আবার ছোট হতে চায়, বোতলে দুধ খেতে চায়, বিছানায় প্রস্রাব করতে চায় এবং কোলে উঠে বেড়াতে চায় ইত্যাদি। এরকম অবস্থায় বরং শিশুটিকে বকাবকি না করে এবং তার হিংসার মনোভাব নিয়ে কৌতুক না করে, তার কিছু কিছু চাহিদা মেটানো ভাল। শীঘ্রই বোতলে দুধ খাওয়ার কাজটাকে

তার নিজেরই বোকা বোকা লাগবে আর বড়দের কোলে কোলে ঘুরে সে ধৈর্য হারাবে। তখন আর সে বাচ্চার মত ব্যবহার চাইবে না। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উপলব্ধি করাতে হবে যে নতুন আসা বাচ্চাটির চেয়ে সে কত বড়, কত বুদ্ধিমান। নবাগত বাচ্চার প্রতিও ভালবাসা প্রদর্শনে ভয় পাওয়া উচিত নয়। শিশুরা বেশী সুখী এবং নিরাপদ বোধ করে যখন তারা অনুভব করতে শেখে যে পরিবারের সকলেই সমান আদৃত। "সে বাবার খুব প্রিয়"—এ ধরনের কথা বড় দুঃখজনক। এ কথা হয়তো গুরুত্ব দিয়ে কেউ বলতে চান না। বড়দের কাছে এটা ঠাট্টার ছাড়া কিছু না। কিন্তু এ ধরনের কথায় যাকে প্রিয় বলা হল এবং যাবে পরিত্যাগ করা হল—উভয়ের মধ্যে অসীম নিরাপত্তাহীন বোধ জাগে। সাময়িক মতবিরোধকে গ্রাহ্য না করে পরিবারের সকলকে সমান ভালবাসা ও প্রশংসা দেখালে সেই পরিবারের শিশুর মনেও বিশ্বাস এবং নিরাপদবোধ আসে। শিশুকে সেরকম পরিবেশেই মানুষ করা উচিত। অনুরূপ ভাবে শিশুদের কখনই বলা উচিত না—'তুমি বাবাকে বেশী ভালবাস, না মাকে?' এভাবে শিশুর মনে বাবা-মায়ের প্রতি ভালবাসাবোধের পার্থক্য সৃষ্টি করা ঠিক নয়। বড়রা এই ধরনের প্রশ্ন করে শিশুর মুখ থেকে উত্তর আদায় করে আনন্দ করেন, কৌতুক করেন। কিন্তু এরকম সব কথায় শিশুর মনে অবাঞ্ছিত লক্ষণ দেখা দিতে পারে এবং এতে তারা অসুখী হয়। শিশুদের এমনকি 'মা-কে মারো তো' বা অন্যদের মারতে বলে বড়রা তামাসা উপভোগ করেন। এর ফল হলো অন্যকে আক্রমণ করে প্রশংসা পেতে বাচ্চাকে শেখানো হলো।

নবাগত বাচ্চার ওপর হিংসার মনোভাবকে ভালবাসার অনুভূতিতে যত্নের সঙ্গে পরিবর্তিত করা যায় যদি বলা হয় যে নবাগত বাচ্চা তো শিশুরাই। তখন নতুন-পাওয়া ভাইবোনের ওপর অপেক্ষাকৃত বড় ভাইবোনের দায়িত্ববোধও বাড়ে। নবাগতকে স্নান করাতে, পাউডার মাখাতে, তার বিছানা তৈরী করতে, তেল মাখাতে সাহায্য করতে বললে শিশু আনন্দ ও গর্ববোধ করবে এবং একটু অপটু হাতে বাচ্চাকে ঘাঁটাঘাঁটি করলেও কোন ক্ষতি করবে না। অগ্রজ শিশুর এই সাহায্যকে প্রশংসা করতে হবে। তাতে সে গর্বিত হবে, তৃপ্তি পাবে। এতে তার হিংসা ক্রমে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হবে। ছোট ভাই বা বোনের জিনিষপত্র ধরতে কখনও বারণ করতে নেই।

তাতে সেই জিনিষ যদি আবার ধুয়ে পরিষ্কারও করতে হয়, তবুও ভাল।

অগ্রজ শিশু যদি একটু বড় হয়, তার যদি বোঝার বয়স হয়, তবে নবাগত শিশুর উপস্থিতির জন্য তার মনকে তৈরী



করে নতুন ভাইবোনের আসার অপেক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে নতুন শিশুর আসার জন্য তার প্রতি ভালবাসার বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে না। নতুন বাচ্চার জন্মের পরও অগ্রজ শিশুর সঙ্গে

বেশী মেলামেশা করতে হবে যাতে সে এটা মনে না করে যে মা তাকে ত্যাগ করেছেন। আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদেরও সতর্ক করে দিতে হবে যে তাঁরা যেন তার দিকে না তাকিয়ে এবং তাকে বাদ দিয়ে কেবল মাত্র নতুন বাচ্চাকে দেখে তার সম্পর্কেই কথাবার্তা ও প্রশংসা না করেন। পরিবারের অন্যান্যরও মনোযোগ নবাগত শিশু ও পুরানো শিশুর প্রতি সমান থাকা বাঞ্ছনীয়।

নবাগত ভাই বা বোনের আগমনের পর তার ওপর অগ্রজের হিংসা-দ্বেষ দেখা না গেলেও একটু বড় হয়ে সেই বাচ্চাই যখন অগ্রজের খেলনা নিতে যাবে, তখন কিন্তু সে তার হিংসা প্রকাশ করে ফেলবে—এরকম দেখা যায়। সে ছোট ভাই বা বোনকে ধরে মারবে। তখন সেই ছোট বাচ্চাকে রক্ষা করতে হবে। সময়মত ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলে অগ্রজকে ভর্ৎসনা করতে হবে ছোটকে মারার জন্য। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাকে স্নেহ-ভালবাসা দেখাতে এবং আদর করতে হবে। কারণ মূলত বড়দের স্নেহাদর দেখানোর ত্রুটির জন্যই শিশুর হিংসা-বোধ আসে।

অগ্রজ শিশুরা অবশ্যই মাঝে মাঝে ঝগড়া করবে। কিন্তু তাদের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে দেওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ তাদের ছোটদের প্রতি প্রতিযোগীর মনোভাব সৃষ্টি যাতে না হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন, "দেখতো তোমার ছোট বোন কত ভাল, ও তোমার মত নয়"—এই কথায় অগ্রজ সন্তান লজ্জা পাবে, নিজেকে ছোট বোনের থেকে নীচু মনে করবে এবং তখনই প্রতিযোগী মনোভাব গ্রহণ করবে। শিশুরা চায় পিতামাতার কাছ থেকে প্রশংসা পেতে। সেই পিতামাতা যখন এইভাবে একটা পক্ষের হয়ে কথা বলেন, তখনই শিশু ছোট ভাইবোনের সঙ্গে ঝগড়া করতে ও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে উৎসাহিত হবে। এই প্রতিযোগী মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করলে তাকে থামিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। তার মনকে অন্য ব্যাপারে প্রবাহিত করে বা ছোট ভাই বা বোনের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিতে হবে। কখনই তাদের যুক্তিতর্কের ভিতরে নিজেকে জড়িয়ে একের চেয়ে অপরকে বেশী নিন্দা বা প্রশংসা করা উচিত নয়।

বিশেষ সমস্যা: ছোট বয়সে শিশুর খেলাধুলা যে নিছক আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার নয় এটা অধিকাংশ বাবা মা-ই উপলব্ধি

করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই খেলার মধ্যে দিয়েই শিশুর স্কুলে যাওয়া বা অন্যান্য শিক্ষার হাতেখড়ি হয় বলা যায়। শিশুর স্বাভাবিক ইচ্ছাগুলিকে সঠিক পথে চালিত করবার জন্য তাকে ইচ্ছেমত জিনিষ তৈরি করতে দিতে হয়, তার কল্পনা শক্তিকে বিকশিত করার চেষ্টা করতে হয়। অর্থহীন কিছু ছড়া মুখস্থ করালে কোন লাভই হয় না। যাকে আমরা নিছক খেলা বলি, তারমধ্যে দিয়ে শিশু কিভাবে বিকাশ লাভ করে, তা শিশুর তিনমাস বয়স থেকে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে। তিনমাস বয়সে রঙীন কিছু দেখলেই শিশু উত্তেজিত হয়ে তা ধরবার চেষ্টা করবে। ধরতে না পারলেও বারবার সে হাত পা ছুঁড়তে থাকবে। কয়েক দিনের মধ্যে সে সেটাকে ধরতে শিখে যাবে, তারপর ধরেই সেটাকে সে মুখের মধ্যে পুরে ফেলতে চাইবে। তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই সে একটাকে ফেলে আর একটা খেলনা ধরবার চেষ্টা করবে। ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও আসলে কিন্তু এই খেলার মধ্যে দিয়ে শিশুর দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটছে। বেশির ভাগ বাবা মা এই পদ্ধতির কার্যকারিতা বোঝেন। তাই তাঁদের উচিত এই পদ্ধতিতে শিক্ষার অগ্রগতি চালিয়ে যেতে দেওয়া।

শিশুরা খুবই কল্পনাপ্রবণ হয়। মেয়েরা পুতুল ভালবাসে, বাড়িতে তৈরি সাধারণ পুতুল নিয়ে তারা অনেক কিছু কল্পনা করে, নিজের মত করে সাজায় আবার তা খুলে ফেলে। এদের কাছে দোকান থেকে আনা সাজানো গোছানো দামী প্লাস্টিকের পুতুলের কদর কম, কেন না সাজানো পুতুলে তাদের কল্পনা অনুযায়ী কিছু করার তো থাকে না। আবার ছেলেদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একটা কাঠের সাধারণ বাক্সকে কল্পনায় রেলগাড়ি বানিয়ে কেমন খেলায় মত্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু দোকান থেকে আনা সুন্দর একখানা রেলগাড়ি তাকে বেশিক্ষণ আকর্ষণ করতে পারে না, কেন না সেখানে তার কল্পনার রথ তো থেমে যাচ্ছে।

জল কাদা নিয়ে খেলার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুটি শিশু জল নিয়ে পরস্পরের দিকে ছিটিয়ে খেলায় মত্ত থাকার সময়ে কেমন সুখ অনুভব করে। তাদের এই খেলা বন্ধ করে শিশুকে ছিমছাম রাখাটা কি বোকামী নয়? শিশুর এই সুখ আর আনন্দ কেড়ে

নেবার অধিকার কি কারো আছে? সুখী পরিপূর্ণ শিশু বেড়ে উঠবে সত্যিকারের সুখী ও তাজা পূর্ণমানুষ হিসেবে।

দেওয়াল বা গাছে ওঠার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা শিশুদের মধ্যে আছে। স্বাভাবিকভাবে বাবা মা চাইবেন এসব করতে গিয়ে যেন কোন বিপদ না হয়। বেশ তো, বারণ না করে দূর থেকে লক্ষ্য রাখুন, দেখবেন ওরা নিজেরাই সাবধান হয়ে ঐ খেলায় মত্ত হয়েছে।

প্রথম দুই বা তিন বছর বয়সে শিশুরা সঙ্গীদের সঙ্গে খেলতে পারে না। তখন তাদের বাস তাদের নিজস্ব জগতে। ঐ সময়ে তারা তাদের বাবা-মা বা অন্যান্য বড়দের হাবভাব চলাবলা নকল করার চেষ্টা করে থাকে। এই বয়সে অন্য শিশুদের মধ্যে ছেড়ে দিলেও সে নিজের খেলা নিয়েই মেতে থাকে—দলের খেলায় যোগ দেয় না।

এই বয়সে নিজের জিনিষ বলে কোন ধারণা শিশুর মধ্যে গড়ে ওঠে না, এই সময়ে সে যা চাইবে সেটা দেওয়াই উচিত। এটা অপরের জিনিষ সুতরাং চেয়ো না—এজাতীয় মনোভাব এসময়ে দেখাবার দরকার হয় না, এসময়ে, শিশু নিজের খেলনাও অবলীলাক্রমে অন্যকে দিয়ে দেয় এইভাবে তারা আদান-প্রদান শিখে নেয়, তাই অন্য শিশুদের কাছ থেকে নিজের শিশুকে বেশি বেশি আলাদা করে রাখার চেষ্টা না করাই উচিত। বাবা-মায়েরা যদি বোঝেন অপরের জিনিষ এ বয়সে চাওয়া বা নেওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার, তাহলে তাঁরা সহজেই শিশুকে বিড়ম্বনার মধ্যে না ফেলে যার জিনিষ তাকে ফেরত দিতে পারেন। শিশুরা অন্যদের দেখেই শিখবে যে পরের জিনিষ নিতে নেই, কোনরকম বকাঝকা না করে বাবা-মাকে দেখতে হবে পরের জিনিষ যেন সে ঠিকমত ফেরৎ দেয়।

কর্তব্য: আজকাল অধিকাংশ লোকই বহু আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে থাকার চেয়ে ছোট পরিবারই পছন্দ করেন। তাই শিশুদের যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া কর্তব্য।

শিশুরা গোড়া থেকেই তাদের বাবা-মাকে অনুকরণ করতে ভালবাসে, বাবা-মার মত জামা কাপড় পরতে চায় বা মায়ের রান্নাঘরের কাজকর্ম অনুকরণ করে। এর পরিণতিতে কিন্তু ভালই হয়।

শিশুরা নিজের নিজের জামা কাপড় পরতে শেখে। এই প্রবণতাকে কিন্তু গোড়া থেকেই উৎসাহই দেওয়া উচিত। শিশুকে তার নিজের পোষাক নিজেকেই পছন্দ করে নিতে দিন। খেলার ছলে তাদের নিজের খেলনা নিজেকেই গুছিয়ে রাখতে শেখান! আপনার কাজের সময়ে হাতের কাছে জিনিষপত্র এগিয়ে দিতে বলুন। এইভাবে শিশু বড় হলে দেখা যাবে স্বাভাবিকভাবেই সে সংসারের কাজে আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে, বাবা-মার উচিত নয় শিশুর সব কাজ করে দেওয়া। বরং ভালভাবে তাদের বলা উচিত বাবা-মার কাজে সাহায্য করার জন্যে। এই ভাবে সাহায্যের মনোভাব গড়ে উঠবে শিশুর মধ্যে।

ঘুমের সমস্যা : ছোট্ট শিশু তার দরকার মত ঠিকই ঘুমিয়ে নেয়, কিন্তু শিশু একটু বড় হলে তার দরকার মত ঘুমের ব্যাপারটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ঘুমের গুরুত্বটা কিন্তু অনেক বাবা মা-ই বুঝতে পারেন না, তাঁদের আশা, শিশু তাঁদের জীবনযাত্রার অনুসারীই হবে। তার মানে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজবের পর বা টেলিভিশন শো দেখার পর অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তবে ঘুমের ব্যবস্থা। দুবছর বয়সের শিশুর নিজের একটা ইচ্ছা অনিচ্ছার জন্ম হয়। এই সময়ে সে সহজে ঘুমোতে চায় না। এই সময়ে সঙ্গীদের নিয়ে খেলাতেই তাদের বেশি ঝোঁক থাকে, টেলিভিশন দেখতেও তাদের ইচ্ছে হয়। মোট কথা যতক্ষণ না খুব ঘুম পাচ্ছে ততক্ষণ তারা কিছুতেই শোবে না। কিন্তু এটা চলতে দিলে তার ঘুমোতে ক্রমাগত দেরিই হতে থাকবে—পরিণতিতে সকালে উঠে স্কুলে যাওয়াটা একটা সমস্যায় দাঁড়িয়ে যাবে। এর অর্থ হলো, তার যতটা ঘুমের দরকার, ততটা ঘুম হচ্ছে না, এর ফলে শিশুকে অসুস্থ দেখায়, তাদের মাথা ধরে ও তারা কোনমতেই পড়াশোনায় মন দিতে পারে না। বাবা-মা এক্ষেত্রে শিশুকে টনিক খাইয়ে স্কুলের কাজ শেষ করার জন্য অনেকক্ষণ বসতে বাধ্য করেন। অনেকক্ষণ ধরে বই নিয়ে বসতে বাধ্য করলে সে কিছুতেই পড়াতে মনোনিবেশ করতে পারে না। স্কুলের কাজ তখন তার কাছে বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তাই বাবা-মাকে বুঝতে হবে শিশুর চাই পর্যাপ্ত ঘুম। একটি দু-বছরের শিশুর চাই বারো ঘণ্টা ঘুম, ছয় থেকে নয় বছরের শিশুর এগারো ঘণ্টা আর বারো বছরের হলে ৯/১০ ঘণ্টা ঘুমোলেই

চলবে। এই সময়ের পার্থক্য অবস্থা বিশেষে হতেই পারে—সব ব্যাপারটাই অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। তাই দেখতে হবে যাতে শিশু তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যায় ও প্রয়োজনীয় সময়টুকু ঘুমোতে পারে। অবশ্য মাঝেমধ্যে নিয়ম ভাঙতেই পারে, কিন্তু তা কেবল ব্যতিক্রম, কিন্তু সপ্তাহের ছুটির দিন বাদে সবদিন বাঁধা রুটিন অনুযায়ী চললে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে—ফলে শিশুর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে অসুবিধে হবে না।

ঘুমোবার আগে বাড়ির পরিবেশ শান্ত থাকা দরকার। শিশু যেন ঐ সময়ে খুব উত্তেজিত বা অত্যন্ত ক্লান্ত না থাকে। এর জন্যেও রুটিন অনুসরণ করা দরকার। আরাম করে শুইয়ে এসময়ে তাকে গল্প বলা যেতে পারে। এ সময়ে কেউ যেন শিশুকে বিরক্ত না করে। এতে হয়তো আপনার ওপর বাড়িতে আগন্তুক আত্মীয় বা বন্ধু ক্ষুণ্ণ হতে পারেন, কিন্তু সেটুকু মেনে নিতেই হবে, শুধু এটুকু কেন স্বাস্থ্যবান সন্তান পেতে হলে অনেক স্বার্থই ত্যাগ করতে হয়।

আধুনিক মা-বাবারা শিশুর ঘুমের ব্যাপারে অবহেলা করেন দেখেই এত কথা বলার দরকার হলো।

কর্মরতা মায়েরা : কর্মরতা অনেক মা-ই মনে করেন তাঁরা কিছুতেই আদর্শ মা হতে পারছেন না। আমাদের সমাজে আজও এই ধারণা প্রচলিত যে, সন্তান পালন একমাত্র মায়েরই কর্তব্য। মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসার আর সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক চাপ মেয়েদের বাইরে বেরিয়ে কাজ খুঁজে নিতে একরকম বাধ্য করছে। তবে একথা ঠিকই যে জোর করে কোনমতেই বলা যাবে না—কর্মরতা মা মাত্রেই খারাপ আর ঘরে থাকা মা মাত্রেই ভাল। দেখা গেছে বেশির ভাগ কর্মরতা মহিলা কাজের পর প্রায় সবটুকু সময়ই বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে কাটাতে ভালবাসেন, অপরদিকে যে সব মহিলা বাড়িতে থাকেন তাঁরা ক্রমেই দৈনন্দিন একঘেঁয়ে কাজের মধ্যে, সাংসারিক নানা সমস্যার মধ্যে একঘেঁয়ে বোধ করেন। তাই আমাদের ধারণা বাইরে কাজ করতে বেরুলেই যে মা হিসেবে খারাপ হয়ে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই। এ নিয়ে অনেকে কটাক্ষ করতে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের মুখ বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থাই করা উচিত। দেখা গেছে শিশু বড় হয়ে তাদের মায়ের কর্মরতা ভূমিকার জন্য গর্বই বোধ করছে। আদর্শ মা হতে গেলে কর্মরতা

মহিলাকে এমনভাবে কাজের বণ্টন করে নিতে হবে যাতে সংসার বা কাজ কোনটাই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সন্তানের জন্মের পর এক বা দুমাস পর্যন্ত মা তো ছুটিই পান। এই সময়ে শিশুকে যতটা সম্ভব বুকের দুধ খাইয়ে যাবেন। পরে অবশ্য বোতলের দুধ তো খাওয়াতে হবেই। কিন্তু কাজে যোগ দেবার পরও শিশুকে বুকের দুধ দেওয়া বন্ধ করবেন না। নবজাতকের সহজেই সংক্রামিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আর বুকের দুধ হচ্ছে সেই সংক্রমণের সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে বোতলের দুধ খাওয়া শুরু করার সময়ে কোন কোন শিশুর গোড়ার দিকে গরুর দুধে অ্যালার্জি দেখা দিচ্ছে—এর থেকে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তাই মায়ের কাজে যোগ দেবার অন্তত দু সপ্তাহ আগে শিশুকে বোতলের দুধ ধরাতে হবে। যে সব মায়ের কাজের সময় অপেক্ষাকৃত অল্প তাঁরা জীবাণুমুক্ত বোতলে শিশুর অন্তত একবার খাবার মত বুকের দুধ ধরে রেখে দিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু তা সম্ভব না হলে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাবধানতার সঙ্গে টিনের দুধ তৈরি করে প্রথমে এক বোতল ও ক্রমে তা বাড়িয়ে দু বোতল খাওয়ানো যেতে পারে। কিন্তু বাড়িতে থাকার সময় মায়ের উচিত হবে যতদিন সম্ভব ততদিন বুকের দুধ শিশুকে খাইয়ে যাওয়া। এটা যে কেবল শিশুর পক্ষে মঙ্গলজনক তাই নয় এতে মায়েরও অনেক পরিশ্রম বাঁচে।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থায় মা ছাড়াও সংসারে শিশুকে দেখার লোকের অভাব হয় না, তাই বাড়িতে এসে কৃতজ্ঞ বা স্বাভাবিকভাবেই শিশু পরিচর্যাকারিনী আত্মীয়ার কাজে সাহায্য করতে চাইবেন। যদি পরিবারে সে রকম কাউকে পাওয়া না যায়, তাহলে মাকে বাইরের সাহায্য নিতেই হয়। বড় বড় শহরে ভাল ভাল ক্রেচ আছে—সে সব জায়গায় অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত লোকেরা শিশুর দেখাশোনা করে থাকেন। কিন্তু এই ক্রেচের সংখ্যা খুবই সীমিত, তাই এই অবস্থায় মাকে বাইরের লোকের শরণাপন্ন হতেই হয়। এই সব ক্ষেত্রে কাজে বেরিয়ে যাবার আগে শিশুর স্নান বা কঠিন খাদ্য খাওয়াবার ব্যাপারটা নিজের উপস্থিতিতেই সেরে নেওয়া উচিত। সাহায্যকারিনী যদি চটপটে হয়, তাহলে তাকে শিখিয়ে নিতে হবে কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বোতল পরিষ্কার করে দুধ ভরতে হয়।

নইলে নিজে এক বা দু-বোতল দুধ তৈরী করে ফ্রিজে রেখে বেরোন ভাল। নইলে থার্মোফ্লাস্কে গরম জল রেখে যেতে পারা যায়। পরে দরকার মত তাই দিয়ে দুধ তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম প্রথম সাহায্যকারিনীকে মা নিজের সামনে দুধ তৈরি করতে বলবেন —যাতে সে ঠিক ঠিক সব কিছু করতে পারে।

মায়ের পক্ষে চাকরী ও ঘরের কাজ একা হাতে নিপুণভাবে করা যে সম্ভব নয় এটা শিশুর বাবারও বোঝা উচিত। আমার জানা এক যমজ কন্যার বাবাকে খুবই তৎপর দেখেছি এ ব্যাপারে। তাঁর স্ত্রী স্কুলে চাকরী করেন, কিন্তু স্বামী নিপুণভাবেই তাঁর অনুপস্থিতিতে কন্যাদের পরিচর্যা চালিয়ে গেছেন। এতে সংসারে সুখ ও শান্তি দুই-ই বাড়ে, অবশ্য বাড়িতে এতটা সময় দেওয়া বাবাদের পক্ষে খুবই শক্ত। কিন্তু বাড়িতে থাকার সময়ে শিশুর কাঁথা বদলানো, এক আধবার খাওয়ানো বা ঘুম পাড়ানোর মত কাজ অনায়াসেই করতে পারেন।

এসবই ঠিক মত চলতে পারে যতক্ষণ শিশু সুস্থ থাকে। শিশু অসুস্থ হলে মায়ের পক্ষে তাকে ছেড়ে যাওয়া কঠিন। অসুস্থ শিশু সব সময়েই মাকে চাইবে, তাই মা হবার পর অফিসের ছুটি নেওয়ার ব্যাপারে একটু সাবধান হতেই হবে। আনন্দ-উৎসব বাদ দিয়ে এই সব ছুটি জমিয়ে রাখতে হবে শিশুর সম্ভাব্য প্রয়োজনের তাগিদে। যেহেতু দিনের অনেকটা সময় মাকে শিশুর থেকে আলাদা থাকতে হয়, সেইহেতু বাড়িতে থাকার সময়টুকুর বেশিটাই কিন্তু শিশুর সঙ্গে কাটানোর জন্য রাখতে হবে। অন্যকাজে বরং সাহায্যকারিনীকে লাগিয়ে দেওয়া ভাল। এই সময়ে মা অবশ্যই শিশুর সঙ্গে খেলা করবেন বা ছবি দেখাবেন। এই সব ছোটখাটো জিনিষের মধ্যে দিয়েই কিন্তু মা ও সন্তানের মধ্যেকার মধুর সম্পর্ক দৃঢ়তর হতে থাকে।

শিশুর লালন-পালনের শৃঙ্খলা এবং উদ্দেশ্য :

পিতামাতা কর্তৃক স্থাপিত আদর্শ ও মান অনুযায়ী শিশু বড় হয়, সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে। অবশ্য সব পিতামাতাই চায় তাঁদের শিশু সুন্দর হয়ে মানুষ হোক। মন্দ বা দুষ্টু শিশু কখনই সুখী শিশু হয় না। মূলত শিশুরা নিশ্চিত হতে চায় যে

যথেষ্ট স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা তাদের জন্য সঞ্চিত আছে এবং সুষ্ঠু পরিচালনার নিরাপত্তার আশ্বাসও রয়েছে। এটা বলা সহজ, বাস্তবে রূপদান করা তত সহজ নয়। সমস্ত পিতামাতা তাঁদের সন্তানকে ভালবাসেন। কেউ কেউ ভয় পান যে শিশু সন্তানদের প্রতি কঠোর হলে তারা তাঁদের প্রতি বিরূপ হবে। তাঁরা ভাবেন যদি তাঁরা ছেলেমেয়েদের ইচ্ছানুরূপ জিমিষপত্র দেন এবং যথেচ্ছভাবে চলতে দেন, তবে ছেলেমেয়েরা তাঁদের ভালবাসবে, সুখী হবে। কিন্তু শাসন করার জন্য কখনও কখনও কঠোর হতে হয়।

ছেলেমেয়েকে সুশৃঙ্খল করতে চেষ্টা করলে তারা সাময়িকভাবে পিতা ও মাতার ওপর রাগ করতে পারে, কিন্তু শৃংখলার সঙ্গে কাজ করতে শিখলে তারা ভবিষ্যতে বেশী সুখী হবে। এতে তার আত্মবিশ্বাস জন্মাবে এবং নিজেকে সংযত রেখে শোভন আচরণ করবে। সন্তানের প্রতি প্রকৃত স্নেহ থাকলে পিতামাতা তাদের ভালোর জন্যই সাময়িকভাবে তাদের প্রতি কঠোর হবেন। ফলে ভবিষ্যতে সন্তানের আদর্শ স্থাপনে সফল হবেন, তাদের শ্রদ্ধাভাজন হবেন।

শিশুকে সুশৃঙ্খল হতে শেখানো মানে সব সময় বকাবকি করা এবং শাস্তি দেওয়া নয়। প্রশ্রয়পূর্ণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা কঠোর শৃঙ্খলাযুক্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই বেশী সমস্যাকীর্ণ হয়। শিশুদের জীবনে সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন সেটা হল ভালবাসার নিরাপদ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ছোটবেলা থেকে অপরকে শ্রদ্ধা করতেও তাদের শেখানো কর্তব্য। বাবার যদি বাড়ীতে কাজ থাকে, শিশুকে বুঝতে হবে যে তাকে শান্ত হয়ে খেলতে হবে। এভাবে বোঝাতে হবে অপরের ভালবাসার প্রতিদানে তারও কিছু করণীয় আছে। সেখানেই সব নয়। একবার শিশুকে অপরের জন্য কিছু করতে বলার পরও নিশ্চিন্ত হতে হবে যে সে বড়দের কথা শোনে।

ভয় দেখিয়ে শৃঙ্খলা শেখাতে শুরু করলে শিশু তা মানতে অস্বীকার করবে। আবার পুরস্কার দিয়েও শিশুকে তার কর্তব্য করানো উচিত নয়। তখন সে কর্তব্য করবে পুরস্কারের লোভে, পিতামাতার প্রতি বাধ্যতা, শ্রদ্ধা এবং নিজের বিবেচনাতে উদ্বুদ্ধ

হয়ে নয়। শিশুকে যা করতে বলা হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে সে তা করে কিনা। কোথাও বেড়াতে গিয়ে যদি শিশু তার বন্ধুর খেলনা নিয়ে বাড়ী রওনা হতে চায়, তবে তাকে সোজা বলে দিতে হবে যে খেলনাটা তার নয়, তার বন্ধুর। শিশু কান্নাকাটি করলে, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে দাপালেও তৎক্ষণাৎ সেই খেলনা তার হাত থেকে নিয়ে তার বন্ধুকে দিয়ে দিতে হবে। কান্না শীঘ্রই সে থামাবে। পরের দিন কারুর খেলনা নিতে নিষেধ করলে সে বুঝতে পারবে সেই নিষেধের অর্থ কী।

বহু শিশু তাদের পিতামাতার কথা মানতে অস্বীকার করে। তারা দুষ্টুমি করেই যাবে এবং পিতামাতার কথায় রুক্ষ ব্যবহার প্রকাশ করবে। ভাবটা যেন পিতামাতা কি করতে পারে করুক। আশ্চর্যজনকভাবে অনেক ভদ্র ও রুচিবান পিতামাতা তাঁদের ও অন্যদের প্রতি শিশুর এইরকম রুক্ষ ও অভদ্র ব্যবহার মেনে নিয়ে একটি প্রতিবাদও করেন না। এতে শিশুও প্রকৃতপক্ষে খুশী হয় না। সে তার মনের দিক থেকে চায় কেউ তার রুক্ষ ব্যবহার ও দুষ্টুমি থামাক। তখন নিজের ওপরই নিজে সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, নিজেকে অপরাধী বোধ করে নিজের খারাপ ব্যবহারের জন্য। যখন মা ও শিশু উভয়ে শান্ত ও ভাল মনে থাকবে, তখন শিশুকে বুঝিয়ে বলতে হবে খারাপ ব্যবহার না করার জন্য। তার ক্রমাগত খারাপ ও রুক্ষ ব্যবহার মেনে নিলে শিশু উদ্ধত স্বভাবের হবে, পিতামাতাও হঠাৎ তাঁদের ধৈর্য হারিয়ে মেজাজ নষ্ট করে বসবেন। এতে শিশুর কিছু ভাল হবে না। পিতামাতা যুক্তিনিষ্ঠ ও দৃঢ় হলে ছেলেমেয়েরা তাঁদের কথা শুনবে। চিৎকার করে বা একটা চড় মেরে শাসন করতে সুরু করলে তখনকার মত শিশু ভয় পেলেও তাদের আচরণকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে না। অনেক সময় দেখা যায় পিতামাতা তাঁদের মেজাজ গরম করার পর, নিজেদেরই অপরাধী মেনে নিয়ে শিশুকে আর সংশোধন করার চেষ্টা করেন না এবং ভবিষ্যতে শিশু রুক্ষ আচরণ করলে তাঁরা ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। তখন শিশুও চেষ্টা করবে সেই ব্যাপারে পিতামাতাকে বারে বারে প্ররোচিত করে তুলতে। শিশুকে অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে লক্ষ্য রাখতে হবে তারা সে কাজ বন্ধ করে কি না, এরকম ভাবে আদর্শের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তাদের খারাপ ও রুক্ষ ব্যবহার এবং দুষ্টুমি করতে নিষেধ করে

যেতে হবে। তবেই শিশুর কাছ থেকে প্রত্যাশিত ব্যবস্থার সম্বন্ধে পিতামাতা সুনিশ্চিত হবে।

মিথ্যা ভয় দেখিয়েও শিশুকে শাসন করা উচিত নয়। 'ভূত এসে তোমাকে নিয়ে যাবে'—এরকম ভয় দেখালে ভীতুদের মনে স্বাভাবিক ভয় জন্মাবে এবং চতুর শিশু শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে এই ভয় দেখানোর মধ্যে কোন সত্য নেই। পিতামাতা যা বলেন, তা যদি স্বাভাবিক ও সঠিক হয়, তবেই শিশুরা তাদের কথা শুনবে।

অনেক পিতামাতা শাস্তিদান করা উচিত কি অনুচিত—এই ভেবে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। এর কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই। এটা উপলব্ধি এবং পর্যবেক্ষণের ব্যাপার। শিশুকে শেখানোর জন্য যদি শাস্তি প্রদানই একমাত্র পথ বলে বিবেচিত হয়, তবে শাস্তি নিশ্চয়ই দিতে হবে। কিন্তু শাস্তি দেবার পরও যদি সংশোধন না হয়, তবে সেই শাস্তি অকেজোই শুধু নয়, তার ফল হয় আরও খারাপ। শাস্তিই শৃঙ্খলার একমাত্র পথ নয়, একটা অংশমাত্র। শিশুকে একটা চড় মেরেই খালাস—তারপর আর তার কর্তব্য সম্বন্ধে লেগে না থাকলে শিশু শুধু সেই শৃঙ্খলা বা কর্তব্যকেই অবজ্ঞা করবে না, সেই শাস্তিকেও অবজ্ঞা করবে। যে শিশুকে পিতামাতা স্বাভাবিক ভালবাসা ও স্নেহ দিয়ে মানুষ করেন, অশান্তি দিয়ে তাঁদের স্নেহের অমর্যাদা সে কখনই কোনভাবেই করতে চায় না। পিতামাতা শিশুকে প্রকৃত খারাপ কোনও কাজের জন্য শাস্তি দিলে বা বকলে তার সাময়িক রাগ বা দুঃখ হতে পারে মাত্র। শীঘ্রই তা দূর হয় এবং স্নেহ, মায়ার ও শ্রদ্ধার বাঁধন অটুট থাকে। কিন্তু ক্রমাগত এই রাগ ও দুঃখের কারণ ঘটালে ক্ষতি হতে পারে। শিশুর প্রতি ভালবাসা এবং তার প্রতি সপ্রশংসভাব তাকে উপলব্ধি করাতে হবে। পিতামাতাই তার আবেগ ও নিরাপত্তাবোধের প্রধানতম উৎস। সুতরাং তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে কোনও শিশুই চায় না।

শিশুর সামনে উপস্থাপিত আদর্শের মান পিতামাতা প্রায়ই উপলব্ধি করেন না। তাদের রুক্ষ, অন্যায় ও নির্দয় ব্যবহার শিশুও অনুকরণ করে। কেবল পিতামাতাকে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে শিখলেই চলবে না। ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো, উঁচু-নীচু নির্বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সদয় হতে শিখলে ভবিষ্যৎ জীবনে সে শ্রেয় এবং সুখী নাগরিক হতে পারবে। অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সদয়

পিতামাতার সন্তান তার পিতামাতার এই গুণগুলিকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার হিসাবে গ্রহণ করে সেই আদর্শে নিজেদের জীবনও পরিচালিত করবে।

আমাদের দেশের শিশুদের পশুদের ওপর নির্দয় আচরণ করতে প্রায়ই বারণ করা হয় না। প্রবৃত্তিগত ভাবেই শিশুরা একগুঁয়ে এবং তারা নিরীহ প্রাণীর প্রতি সেই নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে, যেহেতু নিরীহ প্রাণীরা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। শিশু একটা কুকুরকে হঠাৎ একটা লাথি মেরে দিলে বা একটা বিড়ালকে ঢিল ছুঁড়লে অথবা কোন পতঙ্গকে সুতো দিয়ে বাঁধলে পিতামাতা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। এতে শিশুর হৃদয়হীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অপরদিকে তাকে বঞ্চনাও করা হয়। কারণ পশু-পাখীদের জানা এবং তাদের ভালবাসা হৃদয়বৃত্তির একটা সুন্দর ও কোমল দিক— তার থেকে শিশুকে বঞ্চিত করা হয়। আমার মনে হয় যে, কষ্ট করে পিতামাতারা শিশুদের নানা চালচলন ও অভ্যাস, যেমন খাবার আগে হাত ধোয়া ইত্যাদি শেখান, সেই অভ্যাস ও চালচলন শেখানো থেকে দুর্বলতর প্রাণীর প্রতি ভালবাসা ও যত্ন প্রদর্শন করতে শিশুদের শেখালে তার গুরুত্ব অনেক বেশী। কারণ এইগুলিও জীবনের সম্পদ যা পরবর্তী জীবনে অর্জন করা যায় না। যে শিশু পোষা কোনও পশুর সঙ্গে থেকে বড় হয়ে ওঠে, তার পশু সম্বন্ধে পারস্পরিক বোঝাপড়া সারা জীবন জুড়ে থাকবে। এটা খুবই দুঃখের যে শৈশবে পোষা পশু থেকে বঞ্চিত আমাদের কত শিশু পশুর ওপর বিরক্ত হয় এবং যে কোন পশুকে ভয় পায়।

জীবনে সুখী হতে হলে শিশুকে সৃজনশীল হতেই হবে। তাকে দেওয়া চমৎকার সব খেলনা সো-কেসে চাবিরুদ্ধ করে রাখলে তার মূল্য নেই। শিশুকে খেলনা দিয়ে খেলতে দিতে হবে। সেই খেলনা অতি মূল্যবান বা দর্শনীয় না হলেও চলে। কিন্তু সেগুলো যেন শিশুর কল্পনাকে উদ্দীপিত করে। বাচ্চা ছেলেদের রেলগাড়ী তৈরী করার জন্য খণ্ড খণ্ড খেলনা দেওয়া ভাল। জোড়া দিয়ে তৈরী আস্ত রেলগাড়ী কিনে দিলে প্রথম উত্তেজনায় তা ভাল লাগলেও কদিন পরেই তা শিশুর কাছে একঘেয়ে হয়ে যাবে, সেটার জন্য আকর্ষণ আর থাকবে না। কারণ তার মধ্যে সৃষ্টির আহ্বান নেই। অথবা কাঠের ও কোন ধাতুর তৈরী ব্লক যা জোড়া দিয়ে ব্রীজ বা

গম্বুজ করা যায়, সেগুলো ছোট ছোট ছেলেদের দেওয়া যায়। তারা এই ধরনের খেলনায় আনন্দ পায়, সৃষ্টির সাড়া পায়। ছোট মেয়েদের গৃহস্থালী জিনিষপত্র দিলে তাদের কল্পনায় ঘেরা একটা ছোট সংসারই পেতে ফেলতে পারে। এক টুকরো কাপড় দিলে তা কেটে তার মাকে অনুকরণ করে ছোট ছোট পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী করতে পারে। যে শিশু নিজে থেকে খেলনা ও খেলা তৈরী করতে পারবে, ভবিষ্যতে তারা সম্ভাবনাময় হয়।

খুব ছোটবেলা থেকে শিশুদের পড়ার অভ্যাস গঠিত হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পিতামাতাগণ তাঁদের সন্তানদের প্রতি স্নেহ স্বরূপ দামী পোষাক কিনে উপহার দেন। সাময়িকভাবে শিশুরা তাতে খুব আনন্দ পায় বটে। কিন্তু সেই উপহার তাদের সক্রিয়তা ও উদ্দীপনাময় প্রেরণা জোগাবে না। সুন্দর সুন্দর বই কিনে দিলে খুব ভাল। কিন্তু সেগুলো আলমারিতে চাবি দিয়ে যত্ন করে রাখলে তা মূল্যহীন। পড়তে শেখার আগেও শিশুমনের উপযুক্ত গল্প পড়িয়ে শোনালে শিশু মুগ্ধ হয়ে তা শুনবে। ছবির বই থেকে ছবি দেখিয়ে এবং সেই ছবিকে কেন্দ্র করে গল্পের জাল বুনলে ছোট ছোট শিশুরা অভিভূত ও আকৃষ্ট হয়ে তা শুনবে। শৈশবে পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করে দিলে ভবিষ্যৎ জীবনকে তা পূর্ণ করে তুলবে। কেবলমাত্র স্কুলের পাঠ্য বই পড়া ও জানা বড় দুঃখের। পরিশ্রমী ও ভাল ছাত্র হয়েও তার জ্ঞান সীমিত থাকবে এবং পড়া শেষ হয়ে গেলে পাঠ্য বই-এর সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন থেকেও বই বিদায় নেবে।

দুই বছরের শিশুর পক্ষে তার বাবা-মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলা এবং যা তাকে করতে না বলা হবে তা-ই করা খুব স্বাভাবিক। কারণ এ বয়সটা অস্বীকার করার বয়স। কিন্তু তিন বছরের পর সে বাবা-মায়ের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন ও প্রীতিপূর্ণ হবে। তিন থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা বাবা, মা ও বড়দের যথাসম্ভব অনুকরণ করবে—কথায় খেলায়, কাজে ও ব্যবহারে। এখন বাবা মা কি ভাবে চলবেন—সেটাই সব শিক্ষাকে ছাপিয়ে শিশুকে প্রভাবিত করবে।

নবম অধ্যায়

শৈশবে সাধারণ কয়েকটি অসুখ

জ্বর : মুখে থার্মোমিটার লাগিয়ে তাপমাত্র ৯৮·৪° ফাঃ অথবা ৩৭° সি চিহ্নে পেঁছালে সেটা দেহের স্বাভাবিক তাপ বলে ধরা হয়। বগলের নীচের তাপমাত্রা ১° ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হয়। অধিকাংশ বাবা-মায়েরা উপলব্ধি করেন না যে—অন্য যে কোন অবস্থায় এই তথাকথিত "স্বাভাবিক" তাপমাত্রা হল অস্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় এটাই দেহ-তাপের গড়। কিন্তু শিশুদের দেহের তাপমাত্রা অনেকটা অবস্থা-নির্ভর হয়। বেশ কিছু দৌড়াদৌড়ি করে এলে বা আবহাওয়া দারুণ তপ্ত হলে শিশুর দেহের তাপমাত্রা ৯৯° ফাঃ অথবা এমনকি ১০০° ফাঃ ডিগ্রী উঠে যেতে পারে। অনুরূপভাবে শিশুকে খুব গরমের মধ্যে রাখা হলে তার দেহের তাপমাত্রাও বেড়ে যেতে পারে। শিশুর সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থাতেই বেশী চলাফেরা করলে তখন, এবং পুনরায় সকালে বা কিছুক্ষণ শান্ত থাকার পর তার দেহের তাপ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তাপের তারতম্য রয়েছে। শিশুকে দেহের তাপ পরীক্ষা করার আগে দেখতে হবে তাকে অতিরিক্ত গরমের মধ্যে রাখা হয়েছিল কি না। সাধারণত মায়েদের শিশুকে গরমের মধ্যে রাখার ঝোঁক থাকে। যদি শিশুর ওজনের ক্রমবৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকে এবং সে যদি স্বাভাবিক খায়, তবে তাকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডার মধ্যে রাখলে সম্ভবত তার দেহের জ্বরো তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে আসবে।

অপর পক্ষে, যদি শিশুকে উপযুক্ত গরমে না রাখা হয় তার দেহের তাপ অতিরিক্ত হ্রাস পেয়ে ৯৭° ফাঃ বা ৩৫° সি ডিগ্রীর নীচে নেমে যেতে পারে। এই তাপমাত্রা বিপজ্জনক। তার গায়ের রঙে গোলাপী থাকলেও সে ভাল করে খেতে চাইবে না এবং তার গা ছুঁলে খুব ঠাণ্ডা বোধ হবে। আমাদের দেশে অবশ্য এই সমস্যাটা ক্বচিৎ দেখা যায় কারণ আমাদের দেশ ঠাণ্ডা প্রধান নয়, বরং গরম প্রধান। সুতরাং এই ধরনের বিপদ সম্পর্কে সকলের ধারণাও নেই। তবে ঠাণ্ডার দিনে শিশুকে উপযুক্ত গরমের মধ্যে রাখা খুব

প্রয়োজন। আর একটা কারণ আমাদের শিশুরা শীতের এই ক্ষতি-কারক ক্ষমতা থেকে সুরক্ষিত। সেটা হলো আমাদের ভাগ্যবান শিশুরা ও নবজাতকরা মায়ের কোলে ঘুমোতে স্থান পায়। মায়ের দেহের তাপ শিশুদের দেহকে গরম রাখে।

অসুখের পর শিশুরা দুর্বল থাকে। তখন তাদের দেহের তাপ স্বাভাবিকের নীচে হ্রাস পায়। একটু বড় হয়ে যাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে এটা তেমন কিছু বিপদের নয়। তাদের উপযুক্ত আরামপ্রদ গরমে রাখার ব্যবস্থা করলেই হয়।

কিন্তু খুব ছোট বাচচার দেহ বেশী ঠাণ্ডা হলে গুরুতর রোগ সংক্রমণ ঘটাতে পারে। সে রকম অবস্থার একমাত্র লক্ষণ হচ্ছে, বাচচাকে রুগ্ন দেখাবে, সে খাবার গ্রহণ করবে না। সে-রকম বিপজ্জনক অবস্থা উপস্থিত হলেই তাকে চিকিৎসক দেখিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার।

পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের খুব সামান্য রোগ সংক্রমণেই মাত্রাধিক জ্বর প্রায়ই হয়। ১০২° ফাঃ ডিগ্রী বা তার বেশী জ্বর উঠলে তাপমাত্রা কমাবার চেষ্টা করা আশু প্রয়োজন। ইতিপূর্বে "জ্বরে পেশীর খিঁচুনি" পর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে ছয় মাস বয়স থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর জ্বর হলে তর্কা বা খিঁচুনি হতে পারে। সামান্য গরম জলে সারা দেহ স্পঞ্জ করতে করতে জ্বরের তাপ প্রথমে কমাতে হবে। যদি পাওয়া যায় স্পঞ্জের জলের মধ্যে অল্প পরিমাণে ও-ডি-কোলোন মেশালে ভাল হয়। এতে শরীরে লেগে থাকা জল দ্রুত বাষ্প হয়ে যায় এবং বাষ্পীভবনের ফলে দেহের তাপ কমে। মাথায় বরফের ব্যাগে কিছু কাজ হবে না। দেহের যত বেশী জায়গা জুড়ে স্পঞ্জ করে ঠাণ্ডা করা যাবে এবং যত দ্রুত দেহের উপরিভাগের জল বাষ্প হয়ে যাবে, তত তাড়াতাড়ি তাপমাত্রা কমবে। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পিঠ, পেট ও বুক বার বার করে স্পঞ্জ করতে হবে। হাওয়া দিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে দেহকে শুকানোর প্রয়োজন নেই। দেহের তাপেই দেহের উপরিভাগের জল শুকিয়ে যাবে। মাথার ওপর সামান্য একটু জায়গা জুড়ে বরফের ব্যাগ দিলে সেই জায়গার রক্তবাহী শিরাগুলি চেপে সংকুচিত হবে।

সুতরাং বরফের ব্যাগ রাখা জায়গায় খুব কম পরিমাণে রক্ত পৌছাবে। যাহোক স্পঞ্জ করলে জ্বর দ্রুত কমবে কিন্তু এটা স্বল্পস্থায়ী হবে, সুতরাং অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে যাতে স্থায়ী ভাবে জ্বর কমে।

অধিকাংশ বাবা-মার ধারণা শিশুর জ্বর হলে তাকে সাবধানে রাখতে হবে তাই তাকে গরমের মধ্যে তাঁরা রাখেনও। কিন্তু এর ফল মোটেই ভাল হয় না। আসলে অতিরিক্ত জামাকাপড় বা চাপা শরীরের উত্তাপ কমাতে সাহায্য তো করেইনা বরং এতে গায়ের তাপ আরও বেড়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত জামাকাপড়ের জন্যে শিশু অস্বস্তি বোধ করবে ও ঘামতে শুরু করবে। এই ঘাম থেকে শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা লেগে যেতেও পারে। তাই আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা না হলে ঘরের জানালা দরজা বন্ধ রাখার দরকার নেই বরং শিশু যাতে আরামে থাকতে পারে তারই ব্যবস্থা রাখা উচিত।

আর একটা ভুল ধারণা, অধিকাংশ বাবা-মা গোপন করে থাকেন, তা হলো জ্বর হলে শিশুকে কোন শক্ত খাবার বিশেষ করে ভাত খেতে দেওয়া যাবে না। অসুখের সময়ে এমনিতেই শিশুদের খিদে থাকে না—তখন তাদের জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করাও ঠিক নয়। এতে তারা আরও অসুস্থ বোধ করবে, সুতরাং খাওয়ার জন্য চাপাচাপি না করাই ভাল। এসময়ে মিষ্ট তরল খাদ্য, টোস্ট জাতীয় হালকা খাবার বা বিস্কুট খাওয়াবার চেষ্টা করা যেতে পারে। দুধ সাধারণত হজম করা কঠিন হয় এসময়ে। তবুও পরিমাণে অল্প দুধ দেওয়া চলতে পারে। জ্বর থাকলেও শিশু যদি খেতে চায় তাহলে হালকা রান্না খাবার দিলে কিছু ক্ষতি হবে না। ভাত সহজে হজম হয়, এতে ক্যালোরীর পরিমাণও বেশি থাকে। গলা ভাত, মাছ ও সবজী এসময়ে অনায়াসেই দেওয়া চলে। এ সময়ে কোনরকম ভাজা জিনিষ খেতে দেওয়া চলবে না, কেননা তা হজম হতে দেরি হয়। ভাজা জিনিষ কিছুটা খাবার পরই খাবার ইচ্ছে বা খিদে চলে যাবে। অসুস্থ শিশু অল্পই খেতে চাইবে, তাই তাকে দুবার খাওয়ার মাঝে টোস্ট, বিস্কুট, ফল এসব দেওয়া উচিত।

শিশুদের বেশির ভাগ রোগই থাকে অল্প কয়েকদিন—তাই ভাববার মত কিছু নেই তাতে। অল্পদিনের মধ্যেই তাদের খিদে

ফিরে আসে ও আবার আগের মতই খেলাধুলায় মত্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু অনেকদিন ভুগলে শিশু একদিকে যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে তেমনি মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বাবা-মার কাছে বায়নার পরিমাণটাও বেড়ে যায়। এই সময়ে তাকে যতদূর সম্ভব খুশী রাখার চেষ্টাই করা উচিত। সুস্থ হয়ে ওঠার পরও কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর এই স্বভাব বদলায় না। এই সময়টা ধৈর্য ধরে তাদের বদমেজাজকে উপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ে কোনমতেই উদ্বেগ প্রকাশ করা চলবে না, তাহলে শিশু সেই উদ্বেগের সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে। নিজেদের স্বাভাবিক রাখতে হবে। এই সময়ে শিশুকে খাবার জন্যে সাধাসাধি না করে তার পক্ষে লোভনীয় কিছু খাবার তার নাগালের মধ্যে রাখতে হবে। খিদে পেলে আপনা থেকেই সে বুঝতে পারবে যে, মেজাজ দেখিয়ে কোন লাভ হচ্ছে না, তাই দেখা যাবে একটু একটু করে সে নিজে থেকেই খেতে শুরু করেছে। অসুস্থতার দিনগুলোতে তাকে কিছু খেলনা বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে অন্যমনস্ক করে রাখা উচিত, তাতে সে নিজের সম্পর্কে বিশেষ কিছু ভাববার অবকাশ পাবে না। আর সেই সঙ্গে তার ছোট্ট শরীরটাও পাবে পর্যাপ্ত বিশ্রাম। এই সময়ে পুরোন বই থেকে ছবি কাটতে দেওয়া যেতে পারে। রং তুলি বা নতুন ধরনের খেলনাও দেওয়া যেতে পারে। এই সময়ে পারলে তার সঙ্গে নিজেদেরও গল্প বলে অথবা গান করে শিশুকে বিছানয় থাকতে সাহায্য করা উচিত।

ঠাণ্ডা লাগা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা : শিশুর ঠাণ্ডা লাগলে জ্বর হতে পারে। অন্য কোনও লক্ষণ দেখা যাবে না। কিন্তু শিশুকে রুগ্ন দেখাবে। পরের দিন তার নাক দিয়ে জল ঝরতে পারে। সাধারণত এই জ্বর ২ থেকে ৫ দিনের মধ্যে কমে যায় যদিও সর্দিটা থাকে। ছোট বাচ্চা ও শিশুদের সর্দি এবং ঠাণ্ডা লাগলে বড় অস্বস্তি হয়, তারা কিছু খেতে পারে না, এমনকি বমিও করে। তখন জোর করে খাওয়াতে নেই। জোর করে খাওয়ালে তারা বমি করে ফেলবে। ফলে তাদের খাওয়ানো নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যতটা খেতে চায়, তাদের ততটাই খেতে দেওয়া উচিত। কিছুই খেতে না চাইলে উদ্বিগ্ন না হয়ে সারাদিন একটু একটু করে জল খাইয়ে রাখতে হবে। একটু সুস্থ বোধ করলেই শিশুর খিদে পাবে এবং

শীঘ্র স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। মনে রাখতে হবে—ক্ষতিপূরণ করার যথেষ্ট সময় আছে। দেখা গেছে শিশু একবার মাত্র না খেলে মায়েরা অশান্তিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

কোন কোন শিশু অন্যান্যদের অপেক্ষা ঠাণ্ডায় বেশী আক্রান্ত হয়। তাদের সম্ভবত অ্যালারজি আছে। অ্যালারজি থাকলে উপর্যুপরি হাঁচবে। এই সব শিশুকে অ্যালারজি প্রতিরোধী ওষুধ দিলে তাড়াতাড়ি রোগ সারবে। অন্যান্য শিশুকে গরম থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডায় নিলে অতি সহজে ঠাণ্ডাটা লেগে যেতে পারে। এটা সত্য যে যারা ঠাণ্ডার মধ্যে থাকতে অভ্যস্ত, তাদের কম ক্ষতি হয়। সুতরাং শিশুদের হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগাতে দেওয়া কখনও উচিত নয়। আবার ঘরের মধ্যেও তাদের সারাটা সময় আটকে রেখে রক্ষা করা ঠিক নয়, যেমন ঠিক নয় প্রত্যেকবার বাইরে বের করবার সময় অত্যধিক কাপড় চোপড়-চাপানো।

টনসিল : গলার পেছনদিকে দুটি গ্ল্যাণ্ডের নাম টনসিল। টনসিলের কাজ সংক্রমণ প্রতিরোধ। ছোটবেলায় টনসিলের আকৃতি থাকে খুবই ছোট। শিশুর বয়স ৪ বা ৫ হলে এগুলির আকার বাড়তে শুরু করে ও ১২ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়তেই থাকে, আবার তারপর থেকে আবার আস্তে আস্তে কমতে থাকে। তাই বার বছর থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত বড় টনসিল ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া চলে এবং প্রকৃতপক্ষে বোঝায় যে শিশুর শরীর সংক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম, এগুলো দেখতে বড় হলেও আসলে কোন অসুবিধের সৃষ্টি করে না। কিন্তু কোন কোন শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের টনসিলই সংক্রমিত হয়েছে, ফলে জ্বর ও ব্যথা। এসব ক্ষেত্রে খুব সাবধানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে কেননা এর থেকে রিউম্যাটিক জ্বরের মত জটিল রোগের সৃষ্টি হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথাযথ চিকিৎসার পর টনসিল আর কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না ও পরে স্বাভাবিক নিয়মমত টনসিল ছোট হয়ে যায়। কিন্তু যদি কোন শিশুর টনসিল বার বার জ্বর সহ সংক্রমিত হয়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেগুলি কাটিয়ে ফেলাই ভাল।

হাম : এমন কোন শিশু বোধ করি নেই যে হামে আক্রান্ত হয় নি। কারণ হাম বড় ছোঁয়াচে রোগ। একবার যে শিশুর হাম

হয়েছে, তার জীবনভোর হাম প্রতিরোধী ক্ষমতা সাধারণত আসে। অনেক মায়েদের কাছে শোনা যায় যে তাদের শিশুর একবারের বেশি হাম হয়েছে। সেটা হয় অন্য কোন রোগ সংক্রমণের ফলে যার সঙ্গে হামের সাদৃশ্য রয়েছে। সাধারণত ৩-৫ মাস পর্যন্ত বয়সের শিশুদের হাম হয় না। কারণ মায়ের কাছ থেকে পাওয়া হাম-প্রতিরোধী ক্ষমতা তারা অর্জন করেছে।

রোগে সংক্রমিত হবার ১০-১২ দিন পর হামের লক্ষণ দেখা যায়। সুরুতে ঠাণ্ডা লেগেছে বলে ধারণা হয়। চোখ অস্বাভাবিক লাল হয়। চোখের নীচের দিকের পাতা টেনে ধরলে চোখের ভিতরটাও দারুণ লাল দেখাবে। জ্বর, সর্দি ও কাশি দিন দিন বাড়তে থাকে। কিন্তু প্রথম ৩-৪ দিনে গুটি দেখা যায় না। দুর্ভাগ্যবশত এই সময়ে হাম হবে বলে বোঝা যায় না। এবং যদিও এই সময়টায়ই হাম সংক্রমণের সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা অধিক, এই ছোঁয়াচে রোগের জন্য সতর্ক হওয়াও সম্ভব নয়। তিন থেকে চার দিনের মধ্যে শিশুর গালের ভিতরের দিকটায় গুটি লক্ষ্য করা যায়। খুব ছোট সাদা সাদা বিন্দুর মত। ৪-৫ দিনে কানের পিছনে, গালের ওপরে, কপালে বেশ হাম দেখা যায়। এবং ক্রমে তা মুখে ছড়িয়ে নীচের দিকে দেহের সর্বত্র ছেয়ে ফেলবে। সবচেয়ে শেষে ছড়াবে পায়ে। হাম যখন প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে তখন জ্বরও খুব বাড়ে। ১০৪° ফাঃ থেকে ১০৫° ফাঃ ডিগ্রী জ্বরও হয়। শিশুকে দেখায় খুব অসুস্থ। হাম ভাল ভাবে ফুটে বার হবার পর তিন থেকে পাঁচ দিনে পায়েও যখন হাম সম্পূর্ণ ছড়িয়ে পড়বে, তখন থেকে জ্বরের প্রকোপ কমতে সুরু করবে। নাটকীয়ভাবে অন্যান্য উপসর্গগুলিও উপশম হতে আরম্ভ করে।

চামড়ার ওপরে যেমন গুটি ওঠে, গলার ভিতরে এবং ফুসফুসের প্রবেশদ্বারেও তেমনি গুটিতে ভরে যায়। ফলে বিশ্রী কাশি হয়। ওষুধ ব্যবহারে এর কোন প্রতিকার বিশেষ হয় না। হাম কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কষ্টকর উপসর্গগুলিও কমে যাবে। অন্ত্রগুলিতেও হাম ওঠে যার ফলে ছাকড়া ছাকড়া পায়খানা ঘন ঘন হয়। হাম কমে গেলে পায়খানা কমে যায়। হাম যে পরিমাণে উঠবে, জ্বর, কাশি এবং পেট খারাপ সেই অনুপাতে হবে। এগুলোর সম্পর্ক আনুপাতিক। কোনও কোনও শিশুর কম হাম

হয়, জ্বরও কম। সাধারণের বিশ্বাস যে হাম সবটা বেরিয়ে না আসলে মারাত্মক খারাপ হয়। এই ধারণা মোটেই ঠিক নয়। শরীরে যদি কম পরিমাণে অথবা দুর্বল জীবাণুর সংক্রমণ হয়ে থাকে তবে রোগের প্রকোপ তো কম হবেই।

হাম দেখা যাবার ৫-৬ দিনের মধ্যে জ্বর না কমলে কমলে কতগুলো জটিলতা দেখা যায়। যেমন ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া অথবা কানের কোন সংক্রমণ—এই জটিলতাগুলি সর্বসাধারণের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষ করে শিশু যত ছোট হবে, জটিলতাগুলি তত বেশী হবে। সেই জন্য হাম হলে শিশুকে চিকিৎসক দেখানো দরকার।

জ্বর থাকাকালীন সময়ে শিশুর খিদে না থাকারই সম্ভাবনা। কিন্তু তখন প্রচুর তরল খাদ্য দেওয়া খুব দরকার। বিশেষ করে যখন জল জল পায়খানা ও জ্বর বেশি থাকবে। এই তরল খাদ্য দুধ, বার্লি, গ্লুকোজ জল খুব পাতলা লিকারের চা ইত্যাদি—যা শিশু খেতে চাইবে, সেটাই দিতে হবে। ঠাণ্ডা আবহাওয়া থাকলে শিশুকে গরমে রাখতে হবে। কিন্তু আবহাওয়া গরম থাকলেও যদি হামে আক্রান্ত শিশুকে অত্যন্ত গরমে রাখা হয়, তার জ্বরে তাপ বেড়ে যাবার অধিক সম্ভাবনা থাকে। মায়েরা নিউমোনিয়ার ভয়ে আবহাওয়ার তারতম্য উপলব্ধি না করেই শিশুকে গরমের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করেন।

হামের গুটিতে সামান্য চুলকায়। তার জন্য করণীয় কিছু নেই। সেরে যাবার পর গায়ে ঈষৎ কালো বিবর্ণ দাগ থাকে। কিছুদিন বাদে তা সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবে।

হাম ওঠার পর অন্তত পাঁচ দিন আক্রান্ত শিশুকে অপরের সংস্পর্শের বাইরে রাখতে হবে।

জলবসন্ত বা চিকেন পক্স: জল বসন্ত যে কোন বয়সের শিশুদের হতে পারে। এমনকি নবজাত শিশুও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণতঃ এই রোগের তীব্রতা কম। এর সঙ্গে অল্প জ্বর হয়। কিন্তু কখনও কখনও বড়দের এবং একটু বড় হয়ে ওঠা শিশুদের এই রোগের আক্রমণ তীব্র হয়। বহু ক্ষেত্রে বসন্তের গুটি দেখা দেবার আগে পর্যন্ত কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না অথবা গুটি ওঠার আগের দিন থেকে শিশুর শরীর অসুস্থ হতে পারে। সাধারণত

পিঠে এবং পেটে প্রথম গুটি ওঠে। উঁচু লাল গুটি দ্রুত তরল পদার্থে পূর্ণ হয়ে যায়। পরের দিন ঐ তরল পদার্থ ঘন হয়ে পুঁজের মতন হয় এবং শুকিয়ে গিয়ে খোস রেখে যায়। নতুন বসন্তের গুটি বেরোতে থাকে এবং মুখে ও সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ৩-৪ দিন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে থাকে, অন্য দিকে পুরানো গুটি শুকিয়ে যেতে থাকে। হামের মতই জল বসন্তের প্রকোপ অনুসারে অসুখের প্রকোপও বাড়ে।

সংক্রমণের ১০ থেকে ২১ দিন পর বসন্তের গুটি বেরোয়। ছোট শিশুর মধ্যে এই রোগের তীব্রতা কম থাকে বলে আমার মনে হয়, তাকে অন্যান্য ছোট স্বাস্থ্যবান ভাই এবং বোনের কাছ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা না করাই ভালো। কারণ তারা যদি বড় হয়ে এ রোগের সংস্পর্শের আসে তাহলে রোগের তীব্রতা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। যাহোক, গুটি প্রথম প্রকাশ হবার আগের দিন থেকে শেষ গুটি বের হওয়ার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত শিশুকে স্কুলে পাঠানো উচিত নয়, কারণ এই সময়েই রোগ ছড়ানোর সম্ভবানা থাকে। শুকনো খোসগুলি ছোঁয়াচে হয় না।

বসন্তের গুটিতে চুলকায় ও জ্বালা করে। ওষুধ দিয়ে তা কমানো যায়। রোগাক্রান্ত শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত উচিত। না হলে তার দেহের বসন্তের গুটি দূষিত ও সংক্রামিত হতে পারে। সেইজন্য তার পোষাক ও বিছানার চাদর প্রতিদিন বদলে দিয়ে হাত পরিষ্কার করে ধুয়ে দিয়ে নোখ ছোট করে কেটে দিতে হবে।

মামস : মায়ের মামস-প্রতিরোধী ক্ষমতা থাকলে নবজাত শিশুও এই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা তাঁর কাছ থেকে অর্জন করে। এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা ৬ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অন্যথায় মামস সব বয়সে হতে পারে। বড় হয়ে মামস আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে শিশুকালে আক্রান্ত হওয়াই (বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রে) বাঞ্ছনীয়। কারণ বেশী বয়সে মামস হলে নানারূপ জটিলতা দেখা দেয়।

মামস ঠিক কান, চোয়াল এবং থুতনির তলাকার লালাগ্রন্থিকে (গ্ল্যাণ্ড) সংক্রামিত করে। সকলেই জানেন যে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয় কানের নীচের গ্ল্যাণ্ডটি। সংক্রমণের সংস্পর্শে আসার ২-৩ সপ্তাহ পর যন্ত্রণাদায়ক ফোলা সুরু হয় এবং দ্রুত ফোলা বাড়তে থাকে। সাধারণত ১-২ দিনের মধ্যেই অপর দিকের গালেও

ফোলা আরম্ভ হতে থাকে। অবশ্য একদিকে মামস হতেও দেখা গেছে। ফোলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর বাড়তে থাকে। কিন্তু অনেক শিশুর মামস হলে জ্বরের তাপ বেশ কমও থাকে। তবে ব্যথা দারুণ হয় এবং গিলতে খুব কষ্ট হয়। টক খেলে ব্যথা অবশ্যই বাড়বে। তাই কোনও কিছু টক এ-সময় খেতে নেই। ৭-১০ দিনের মধ্যে মামসের ফোলা কমে যায়। রোগের আক্রমণ খুব তীব্র হলে বা মৃদু হলে এর আগেও ফোলা কমে। এ রোগের কোন ওষুধ নেই। তবুও চিকিৎসক দেখানো ভাল। কারণ যে ফোলাকে মামস মনে করা হচ্ছে তা হয়তো টনসিলের গ্ল্যাণ্ড বেড়ে গিয়ে হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসা ও ওষুধ প্রয়োজন হবে। মামসের জ্বর এবং ব্যথা কমার ওষুধ দরকার হতে পারে।

মামস হলে বড় ছেলেদের এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জননকোষে প্রায়ই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে—সেটা হলে ভীষণ বেদনা হবে। পূর্বে আশংকা করা হতো যে জননকোষের সংক্রমণে সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সেরকম ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। এইজন্যই শৈশবে মামস হওয়া সেদিক থেকে নিরাপদ।

মেয়েদের ক্ষেত্রেও ডিম্বকোষে একই রকম সংক্রমণ হতে পারে যদিও তা কমই দেখা যায়। সংক্রমণ হলে পেটে ব্যথা হয়।

মামস হলে পেটের ওপরের দিকের ব্যথা অনেকেরই হয়, এটা অস্বাভাবিক নয়। অগ্ন্যাশয়ের গ্ল্যাণ্ডের সঙ্গে এর সম্পর্কের ফলে হয়তো এই ব্যথা। সাধারণত এই ব্যথা হয় মৃদু এবং নির্দিষ্ট কোন ওষুধ ছাড়াই যথাসময়ে কমে যায়। কিন্তু ফোলা সম্পূর্ণ কমে না যাওয়া পর্যন্ত আক্রান্ত শিশুকে বিছানায় শুইয়ে রাখতে হবে। ফোলা কমে যাওয়ার পরও এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্কুলে পাঠানো উচিত নয়।

হুপিং কাশি : হুপিং কাশির প্রতিরোধী ব্যবস্থা সন্তোষজনকভাবে গ্রহণ করা হলেও, অর্থাৎ শিশুর ট্রিপল অ্যাণ্টিজেন কোর্স নেওয়া থাকলেও এই রোগের সংস্পর্শে এসে শিশু মৃদু হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হতে পারে। এমনকি নবজাত শিশুরও এর থেকে রেহাই নেই। হুপিং কাশির নামকরণ হয়েছে 'হুপ' শব্দ থেকে,—যা দমকে দমকে দীর্ঘ কাশির মাঝখানে শ্বাস নেবার জন্য শিশুর অবরুদ্ধ কলা থেকে বার হয়। কিন্তু খুব ছোট বাচ্চাদের হুপিং

কাশি হলে এই শব্দ বৈশিষ্ট্যটি প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। তারা শুধু কাশবে, কাশবে আর কাশবে, কেশে কেশে তাদের মুখ লাল হয়ে উঠবে এবং এক এক দমকা কাশির শেষে বমিও করে ফেলতে পারে।

হুপিং কাশির বহিঃপ্রকাশের ১-২ সপ্তাহ পর প্রকৃত অসুস্থতা সুরু হয়। সুরুতে সাধারণ কাশি ও সর্দির মত এই কাশি আরম্ভ হয়। প্রথম সপ্তাহে সাধারণ সর্দি-কাশি থেকে একে পৃথকীকরণ করা কষ্টকর। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে কাশি মন্দ অবস্থা থেকে মন্দতর অবস্থায় পরিণত হয়। তারপর থেকে থেকে দীর্ঘায়িত কাশির দমকে শিশুর শ্বাস অবরুদ্ধ হয়ে আসবে এবং তার মুখ লাল এমনকি নীলবর্ণ হতে পারে। এই দীর্ঘায়িত কাশির দমকগুলির মধ্যে জোরে শ্বাস নেবার চেষ্টা করার সময় 'হুপ' শব্দটি রোগীর গলা থেকে বেরিয়ে আসে অথবা সে বমি করে ফেলে। হুপিং কাশিতে খুব ছোট বাচ্চা এবং শিশু বয়সের ছেলে ও মেয়ে বেশি কষ্ট পায়। এতে তারা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাধারণত এক মাস অতিক্রান্ত হলে কাশির তীব্রতা কমে। অবশ্যি কোনও কোনও রোগীর ক্ষেত্রে দুই মাস পর্যন্ত কাশির মন্দাবস্থা চলতে দেখা যায়। কাশির তীব্রতা এবং সংখ্যা কিছু হ্রাস পেলেও আরও একমাস পর্যন্ত মাঝে মাঝেই তার অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। হুপিং কাশির চীনা নাম হল 'একশ দিনের কাশি'। শিশু যখন আরোগ্যের পথে তখন যদি তার ঠাণ্ডা লেগে সাধারণ কাশি হয়, তখন হুপিং কাশির প্রকোপও তীব্র হয়।

হুপিং কাশির আক্রমণের প্রথম সপ্তাহে রোগ নির্ণয় করা গেলে সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওষুধ আছে। কিন্তু শিশুর হুপিং কাশির সংস্পর্শে আসার সুনির্দিষ্ট ইতিহাস না পাওয়া গেলে রোগ নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। হুপিং কাশির আক্রমণের এক সপ্তাহ পর ওষুধ দেওয়া সুরু করলে তা খুব কমই কার্যকরী হয়। বিভিন্ন রকমের কাশির শিরাপ এবং রোগের তীব্রতা উপশমের জন্য নানারকম ওষুধ প্রয়োগ করে দেখা গেছে তাতে রোগের তীব্রতার বিশেষ তারতম্য হয় না বা উপকারেও লাগে না।

ভরা পেটে থাকলে বমির দরুন শিশুর কষ্ট হবে। তাই তাকে বার বার অল্প পরিমাণে খেতে দিলে তার সুবিধা হবে। এক দফা

কাশি ও বমির পরই তাকে খাওয়ানো ভালো। কারণ তার পরবর্তী দফায় কাশির সম্ভাবনা কিছুক্ষণ বিরতির পরে।

হুপিং কাশির অনুষঙ্গ রোগ নিউমোনিয়া। সেই জন্য এই কাশিতে আক্রান্ত শিশুকে চিকিৎসাধীন রাখা উচিত।

দীর্ঘ সময় কাশতে কাশতে শিশুর চোখের সাদা অংশের শিরাগুলি ছিঁড়ে গিয়ে চোখে রক্ত জমে ওঠে, চোখ লাল হয়ে ভয়ংকর দেখায়। পরিণতিতে অবশ্য ক্ষতিকর কিছু হয় না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চোখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

ছোট বাচ্চা ও শিশুদের হুপিং কাশি থেকে দূরে রাখা কর্তব্য। কেননা শিশু যত ছোট হবে, রোগের আক্রমণ তত গুরুতর হবে।

কাশি সুরু হবার পর থেকে অন্তত এক মাস পর্যন্ত হুপিং কাশি ছোঁয়াচে থাকে। সেইজন্য এই রোগে আক্রান্ত শিশুকে অপর শিশুদের সংস্পর্শ থেকে ৪ সপ্তাহ দূরে রাখা অবশ্যই কর্তব্য অর্থাৎ যতদিন 'হুপ' থাকবে ততদিনই তাকে আলাদা করে রাখতে হবে।

টাইফয়েড : শৈশবকালীন গুরুতর অসুখগুলির অন্যতম হল এই টাইফয়েড। দুর্ভাগ্যক্রমে আজও এ রোগ আকছার দেখা যাচ্ছে। যাই হোক আধুনিক ওষুধের গুণে এ রোগকে এখন আর মারাত্মক বলা যায় না। যতই চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকুক না কেন, তবুও এ রোগকে গুরুতর রোগ অবশ্যই বলতে হবে। তাই প্রত্যেক বাবা-মার উচিত প্রতি বছর শিশুকে এ রোগের প্রতিষেধক দেবার ব্যবস্থা করা।

শিশুরা সচরাচর না-ফোটানো জল, দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য অর্থাৎ দই, মিষ্টি ও আইসক্রীমের সঙ্গে টাইফয়েডের জীবাণু গলধঃকরণ করে। মাছি বসা খাবার থেকেও এ রোগ হতে পারে। জীবাণু পেটে যাবার দুই বা তিন সপ্তাহ পর থেকে শিশুর মাথা ধরতে থাকে, মাঝে মাঝে জ্বর দিয়ে শুরু করে তা দিন দিন গুরুতর আকার ধারণ করতে থাকে। এই সময়ে সাধারণ সর্দিজ্বর হওয়া শিশুর চেয়ে এই রোগাক্রান্ত শিশুকে বেশী রুগ্ন দেখায়। যথাযথ চিকিৎসায় দুদিনের মধ্যে জ্বর কমে গেলেও শিশুর দুর্বলতা থেকেই যায়। ফলে এই সময়ে তার দরকার সবিশেষ যত্ন। টাইফয়েড হলে দেখা যায় পেটটা ফুলে গেছে রোগীর, তাই সচরাচর রোগীকে তরল খাদ্য দেবার

প্রবণতা দেখা যায়, কিন্তু এখন সংক্রমণ তাড়াতাড়ি আয়ত্তে আসার ওষুধ বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে কেবলমাত্র তরল খাদ্যের ওপর রোগীকে রাখার দরকার পড়ে না বরং শিশুর হজমশক্তি অনুযায়ী তাকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়াই সমীচীন। এই সময়ে রোগীকে স্বল্প ব্যবধানে সুস্থ, তরল খাদ্য, মাছের ঝোল, গলা ভাত এইসব দেওয়া উচিত। এমনকি রুটির সঙ্গে অর্ধসেদ্ধ ডিমও দেওয়া চলতে পারে। কাস্টার্ড জাতীয় পুডিং বা ভাতের পুডিং সহজে হজম হয়। এগুলিও দেওয়া চলে। শাকসব্জী বেশি না দেওয়াই ভাল। এতে পেটের গোলমাল হতে পারে। জ্বর নেমে যাবার পর শিশুকে একেবারে শুইয়ে না রাখলেও চলে। তবে চিকিৎসকের নির্দেশ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করা চলবে না। কেননা, টাইফয়েড পুনরায় হতে পারে।

প্যারাটাইফয়েড : টাইফয়েডের জীবাণু থেকে প্যারাটাইফয়েড হতে পারে। তবে এ রোগ টাইফয়েডের তুলনায় কম গুরুতর। এর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা টাইফয়েডের মতই হবে।

ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস : টাইফয়েডের মতই ছড়িয়ে থাকা জীবাণু থেকে এ রোগের উৎপত্তি, অর্থাৎ সেই দূষিত জল আর ভেজাল খাদ্য। এ রোগের প্রতিষেধক কোন টীকা আবিষ্কৃত না হলেও ব্যাপক সংক্রমণের সময়ে চিকিৎসক শিশুকে আপাত প্রতিষেধক হিসাবে গামা গ্লোবিউলিন দিতে পারেন। মানুষের রক্ত থেকেই এটি তৈরি।

এ রোগটি শিশুদের ক্ষেত্রে বলা চলে হালকা ধরনের অসুখ। এতে সামান্য জ্বর ও বমি হয় সঙ্গে কাম্‌লা হতেও পারে আবার নাও পারে, অর্থাৎ চোখ ও গায়ের চামড়ার রং হলদে হয়ে যেতেও পারে বা নাও পারে। তবে শিশুর জ্বর আর সেই বমি দেখা দিলেই অসুখ কি রকম গুরুতর আকার ধারণ করবে তা বলা সম্ভব নয়, শিশুকে এ সময়ে শুইয়ে রাখতে হবে। অনেক সময় রোগীর পেটের গোলমাল বেশি হলে রান্নাকরা খাবার সহ্য করতে নাও পারে। চর্বি-জাত খাদ্য তার লিভারের ক্ষতি না করলেও পেটকে আরও খারাপ করতে পারে। এই অবস্থায় শিশুর প্রস্রাবের রং গাঢ় হলদে বা বাদামী পর্যন্ত হতে পারে। মলের রংও ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তবে কাম্‌লা দেখা দিলে জ্বর বা পেটের গোলমাল হতে শুরু করে।

এ সময়ে রোগীকে একেবারে শুইয়ে রাখতে হবে। কেননা সম্পূর্ণ বিশ্রামই হচ্ছে লিভারকে সুস্থ করে তোলার একমাত্র উপায়। কোন ওষুধই এই অবস্থায় ঠিক কাজে লাগে না বরং কিছু কিছু ওষুধ ক্ষতি পর্যন্ত করতে পারে। এই সময়ে পথ্যের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। অনেক বাবা-মা অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে দীর্ঘদিন ধরে শিশুকে সেই খাবার খাইয়ে রাখেন। এই সময়ে রোগীকে মিষ্টি পানীয় বা পুডিং জাতীয় খাবার যতটা সম্ভব দেওয়া উচিত। এতে লিভার তাড়াতাড়ি ভাল হবার সুযোগ পায়। ভাজা খাবার পেটের গোলমাল বাধাতে পারে তাই রোগীকে মাছ, মুরগী বা শাকসব্জী খুব হাল্কাভাবে রেঁধে দেওয়া যেতে পারে। অধিকাংশ শিশুই এ রোগ থেকে পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করতে পারে—লিভারের ক্ষতির চিহ্নমাত্র থাকে না। একবার হেপাটাইটিস হলে শিশুর আর তা হয় না। অবশ্য এই ধরনের আর এক রকম জীবাণু থেকে হেপাটাইটিস হতে পারে। সাধারণত যথাযথভাবে জীবাণু মুক্ত না করা ইনজেকসনের সূঁচ থেকে এ রোগ সংক্রমিত হয়ে থাকে।

উদরাময়: শিশুদের মধ্যে উদরাময় হচ্ছে একেবারে সাধারণ রোগ। একেবারে শৈশবে উদরাময়ের হাত থেকে রক্ষা করতে বুকের দুধ খাওয়ানোই প্রকৃষ্ট উপায়। এতে সংক্রমণের ভয় থাকে না। দুধের বোতল বা দুধ যথাযথভাবে জীবাণুমুক্ত না করা হলে শিশু উদরাময়ের শিকার হবেই। ঠিকমত খাদ্য জীবাণুমুক্ত না হলে শিশু বার বারই উদরাময়ের কবলিত হবে। শিশু একটু বড় হলে তাকে উদরাময় থেকে দূরে রাখা খুবই কঠিন, কেন না এই সময়ে সে হামা দেয় আর যা পায় তা-ই মুখে তোলার চেষ্টা করে।

পেট খারাপ হলে পেটে যন্ত্রণা বা শূল বেদনা শুরু হয় প্রায়ই। তাছাড়া এই সময়ে শিশু বমি করে অথবা খেতে চায় না। পায়খানা হবে পাতলা-জলের মত বা আমাশার মত হড়হড়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্গন্ধও থাকে। খুব জলের মত বার বার পাতলা পায়খানা হলে শিশুকে খাদ্য দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দেওয়া ভাল। তবে এ সময়ে পর্যাপ্ত জলীয় পদার্থই তার খাদ্য। ফোটানো জলে একটু চিনি ও লবণ দিয়ে সরবৎ মত তৈরি করে এইভাবে দেওয়া যেতে পারে :

লবণ	৩·৫ গ্রাম (এক চা-চামচ)
সোডা বাইকার্বনেট (বেকিং সোডা)	২ গ্রাম (আধ চা-চামচ)

গ্লুকোজ বা চিনি	২০ গ্রাম (পাঁচ চা-চামচ)

এক লিটার ফুটানো জলে এগুলো মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। অথবা

চিনি	১ চা-চামচ ভর্তি অবস্থায়
লবণ	½ চা-চামচ বা ১চিমটে
ফোটানো জল	৮ আউন্স বা ফিডিং বোতলের এক বোতল
লেবুর রস	½ খানা

তা না হলে এখন পাওয়া যায়, ইলেকট্রয়েট পাউডার—তাও ব্যবহার করা যেতে পারে। এক বছরের কম বয়েসের শিশুদের বেলায় জল দ্বিগুণ মেশাতে হবে (অর্থাৎ পাউডারের প্যাকেটে যতটা জল মেশানোর কথা লেখা আছে তার দ্বিগুণ পরিমাণ জল)। কচি ডাবের জলের কথা সবার জানা। এতে পরিমাণমত লবণ থেকেই যায়। এ সময়ে শিশু যতটা জল খেতে চাইবে ততটা জলই দেওয়া উচিত। বেশির ভাগ গুরুতর উদরাময় আপনা থেকেই সারে, কোন ওষুধ দরকার হয় না। কিন্তু পাতলা পায়খানার সঙ্গে যে জল ও লবণ বেরিয়ে গেছে তা ঠিক ঠিক পূরণ করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানা দরকার। শিশুকে ওপরের প্রণালীতে তৈরি জল দিয়ে অন্য খাদ্য বন্ধ করে দিলেও কোন ক্ষতি নেই। এই সময়ে শিশুর খিদে পেতে পারে। এই সময়ে তাকে ক্ষুধার্ত থাকতে দেওয়াই ভাল। কেননা এ সময়ে খাবার দিলে তার পাকস্থলী বিশ্রাম পাবে না বলে রোগমুক্তি বিলম্বিতই হবে। তাকে সুস্থ হবার সময়টুকু দিতে হবে। একদিন বড়জোর দুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে পায়খানার বার কমে গেছে, মলও আর পাতলা নেই বা দুর্গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে না। এবারে বুকের দুধ অনায়াসেই দেওয়া যেতে পারে। যদি শিশুর বোতলের দুধ খাওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে খুব পাতলা করে দুধ তাকে দেওয়া যেতে পারে। একদিন বা দুদিন পর থেকে আবার তার স্বাভাবিক খাবার দেওয়া চলবে। কিন্তু অতি সতর্ক মায়েরা বেশি সাবধান হতে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে পাতলা দুধ শিশুকে খাইয়ে তাকে দুর্বলই করে ফেলেন।

যদি দেখা যায় একদিন বা দুদিন খাবার বন্ধ করে লবণ ও চিনিসহ ফোটানো জল খেয়ে উদরাময় কমছে না, তাহলে বুঝতে হবে

সংক্রমণের ধরনটা গুরুতর সুতরাং অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো দরকার।

পাতলা পায়খানা বা আমাশায় যদি শিশুর ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তাহলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণে ফল পাওয়া যাবে না। তখন পায়খানা পরীক্ষা করিয়ে রোগের কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

পোকা সংক্রমণ : সকলেই জানেন পোকা বা কৃমি থেকে সংক্রমণ আমাদের দেশে সবসময়েই ঘটে থাকে। এই পোকা প্রধানত তিন রকমের—রাউণ্ড ওয়ার্ম, থ্রেড ওয়ার্ম বা কৃমি আর হুক ওয়ার্ম।

রাউণ্ড ওয়ার্ম থেকে পেটে শূল বেদনার মত যন্ত্রণা আর বমি হয় অনবরত। ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে শিশুর ওজন কমে যেতে থাকে। যদি শিশুর মলে বা বমির মধ্যে রাউণ্ড ওয়ার্ম দেখা যায়, তাহলে তো কথা নেই, নচেৎ তার মল পরীক্ষা করা অবশ্যই দরকার। সুস্থ হবার পর যাতে শিশু আবার আক্রান্ত না হয় তার জন্যে দেখতে হবে খাবার আগে শিশু ভালভাবে হাত ধুচ্ছে কিনা। তা ছাড়া সব কাঁচা তরিতরকারি ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে। কেননা রাউণ্ড ওয়ার্মের ডিম মাটিতেও দেখা যায়।

থ্রেড ওয়ার্ম বা কৃমি খুব সরু সুতোর মত দেখতে। বিশেষ করে রাত্রে শিশুর মলদ্বারে এগুলিকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। কৃমির চিকিৎসার সময়ে দেখতে হবে বাড়িতে আর কারো কৃমি আছে কিনা,—থাকলে তারও চিকিৎসা একই সঙ্গে করতে হবে।

হুক ওয়ার্ম মলের মধ্যে খুব কম দেখা যায়। এগুলো দেখতে খুবই ছোট। নাড়ীর গায়ে এগুলি আটকে রক্ত চুষে খেতে থাকে। ফলে শিশু রক্তহীন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে রক্তহীনতা রোগের অন্যতম কারণ হলো এটি। মল পরীক্ষা করলে হুক ওয়ার্মের ডিমের অস্তিত্ব বোঝা যাবে ও শিশুর যথাযথ চিকিৎসা তখনই শুরু করা সম্ভব। খালি পায়ে খেলার সময় শিশু এই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

সাধারণ একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, এইসব পোকা থাকলে শিশু দাঁত কিড়মিড় করে। এটা ঠিক নয়, শিশুরা ঘুমোলে এমনিতেই দাঁত কিড়মিড় করে এমনকি যথাযথ চিকিৎসার পরও এই

অভ্যাস অব্যাহত থাকে। এ ধারণাও প্রচলিত আছে যে, অতিরিক্ত চিনি বা মিষ্টি খেলেও এই পোকার সংক্রমণ হয়—এটাও ঠিক নয়। পোকার ডিম পেটে গেলেই একমাত্র পোকা বাড়তে পারে—নতুবা নয়।

হাঁপানী : শিশুর হাঁফানী হয়েছে শুনলে স্বাভাবিকভাবেই বাবা-মা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন, তাই তাঁদের জানা দরকার যে শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ শিশুর ছোটবেলায় হাঁফানীর ভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এদের অধিকাংশের বিশেষ করে ছেলেদের এই ভাবটা আসে পাঁচ বছর বয়সে বা অনুকরণ করতে শেখার সময়ে। এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক কিছুই করণীয় আছে।

হাঁফানী এক ধরনের এ্যালার্জি, যে সব পরিবারে এ্যালার্জির প্রবণতা আছে সেই সব পরিবারের ছেলেদেরই প্রধানত হয়। তবে সব সময়ে যে হাঁফানীই হয় তা নয়, কথায় কথায় ঠাণ্ডা লাগা, কোন বিশেষ খাবার খেলে এ্যালার্জি হওয়া এমনকি একজিমার মধ্যে দিয়েও এর প্রকাশ দেখা যায়।

এই রোগ সাধারণত প্রথম দেখা যায় দুই থেকে তিন বছর বয়সে, অনেক ক্ষেত্রে এক বছর বয়সের আগেও এর আক্রমণ দেখা গেছে। এসব ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে জানা দরকার ঐ শিশুর এ্যালার্জির কারণটা কি? তাহলে ভবিষ্যতে এই আক্রমণ রোধ করা সম্ভব।

কিন্তু শিশুকালীন হাঁফানীর ক্ষেত্রে মূল কারণ নির্ণয় প্রায়ই সম্ভব হয় না, কিন্তু শিশু একটু বড় হলে নানা ধরনের চামড়া পরীক্ষার দ্বারা এর কারণ নির্ণয় সম্ভব, কোন কোন শিশুর এ্যালার্জি হয় ঠাণ্ডা বতাসে বা ঠাণ্ডা কিছু খেলে। কোন কোন ক্ষেত্রে তামাকের ধোঁয়া বা বাতাসের ধুলো হয়ে দাঁড়ায় এর কারণ, বাড়ির পোষা জন্তুজানোয়ারও অনেক শিশুর এ্যালার্জির কারণ হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে শিশুর এ্যালার্জি হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে ঘাস বা মরসুমী কোন ফুল এর কারণ, তাই এসব থেকে শিশুকে যথাসম্ভব দূরে রাখা বাঞ্ছনীয়।

ছোট শিশুর ক্ষেত্রে হাঁফানীর কারণ সাধারণত বীজাণু সংক্রমণ থেকে হয়। তাই এর জন্যে বাড়িতে প্রয়োজনীয় ওষুধ মজুত রাখা একান্তভাবে দরকার—যাতে ডাক্তারের কাছে যাবার আগে চিকিৎসা

শুরু করা সম্ভব হয়। যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু হবে নিরাময় তত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে।

যদি একবার বড় ধরনের আক্রমণ শুরু হয়ে যায়, তাহলে তার বড় ধরনের চিকিৎসারও দরকার হবে, দরকার হবে ইঞ্জেকশন ইত্যাদির।

সর্দি-কাশি জ্বরের সঙ্গে ছোট শিশুদের হাঁপানীর সূত্রপাত হয়। তারপর তাদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয় খুব তাড়াতাড়ি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘড় ঘড় শব্দ হতে থাকে। শিশু এ সময়ে খুব কষ্ট করে তাড়াতাড়ি নিঃশ্বাস নিতে থাকে। দিনের বেলায় অপেক্ষাকৃত ভাল থাকলেও এসব ক্ষেত্রে সন্ধ্যার পর থেকে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে।

ফুসফুসে বাতাস যাবার রাস্তাটা ছোট হয়ে গেলে বা শ্বাসনালীর মধ্যে বেশি শ্লেষ্মা জমলে হাঁফানীর সূত্রপাত হয়, ওষুধ এই পথকে পরিষ্কার করে দেয়। তাই যত তাড়াতাড়ি ওষুধ প্রয়োগ করা যায় ততই মঙ্গল। ঘরের আবহাওয়াকে কিছুটা স্যাঁতসেঁতে করে দিলে শিশু কিছুটা আরাম পায়। ঘরের মধ্যে ভিজে তোয়ালে বা কাপড় টাঙিয়ে দিলে ঐরকম আবহাওয়া তৈরি হতে পারে। শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শ্বাসনালীও বড় হয়, ফলে হাঁফানির প্রকোপও কমে যায়। কিন্তু যতদিন ছোট থাকবে, ততদিন বার বার এই আক্রমণের জন্য তৈরি থাকাই ভাল।

বাড়িতে কতকগুলি সাধারণ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। বাড়ির ধুলোবালি ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার না করে ভিজে ন্যাতা দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। পশমের কম্বলের ওপরে সুতিবস্ত্রের ওয়াড় দিতে হবে। বিছানাপত্র নিয়মিতভাবে খোলা বাতাসে রাখতে হবে, এতে কিছুটা কাজ হবে। সাধারণত খাদ্যে এ্যালার্জি থেকে হাঁফানী হয় না। তবুও যদি দেখেন, ডিম বা চিংড়ি খাওয়া বন্ধ করলে হাঁফানী কম হচ্ছে, তাহলে অবিলম্বে তা খাওয়া বন্ধ করে দেবেন। মায়ের দুধ খাওয়া ছেলেদের গরুর দুধ খাওয়া ছেলেদের তুলনায় কম হাঁফানী হয় এটা পরীক্ষিত সত্য।

হাঁফানী আক্রান্ত শিশু ঠিকমত ঠিক ঠিক ব্যায়ামগুলি করছে কিনা, তা দেখা খুবই দরকার। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম—যা গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিতে ও ছাড়তে সাহায্য করে, পেশী আলগা

করে রাখা ইত্যাদি নিয়মিতভাবে করতে হলে শিশুর পক্ষে একঘেঁয়ে লাগা স্বাভাবিক। সেসব ক্ষেত্রে সাঁতার অনেকটা সহায়ক হতে পারে। স্বল্প সময়ের জন্য আয়াসসাধ্য ব্যায়ামের পরে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দিয়ে খেলার মাধ্যমে কাজটা করালে আপনা থেকেই হাঁফানী সেরে যাবে।

ভাবাবেগের সমস্যা থেকেও হাঁফানী হতে পারে। যেমন পরীক্ষার জন্যে উদ্বেগ, বাবা-মার সঙ্গে সংঘাত, এমনকি বাবা ও মায়ের বিরোধও শিশুর হাঁফানীর সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। অবশ্য শিশুর ক্ষেত্রে এগুলি তেমনভাবে প্রযোজ্য নয়। অসুস্থতা থেকে ভাবাবেগের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। বাবা-মায়ের অতি সতর্কতা শিশুর নিজের ওপর আস্থা নষ্ট করে দেয়। তাই শিশুকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেওয়া উচিত।

মৃগী : শিশুর মধ্যে কাঁপুনির ভাব দেখা দিলে চিন্তার ব্যাপার। শিশুর বার বার এই কাঁপুনি দেখে যদি বাবা-মাকে বলা যায় যে শিশুর মৃগী হয়েছে, তাহলে তাঁরা উদ্বিগ্ন তো হবেনই। তখন ঘাবড়ে না গিয়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। এর মূল কারণ সচরাচর দেখা যায় না, তবে কোন কোন পরিবারে কিন্তু বংশানুক্রমিকভাবে মৃগী দেখা যায়। জন্মের পর বা জন্মের আগে শিশুর মস্তিষ্ক কোনভাবে আক্রান্ত হওয়াটা মৃগীর কারণ হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে মাথায় গুরুতর আঘাতের ফলেও মৃগী হয়েছে দেখা গেছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ জানা না গেলেও ওষুধ দিয়ে মৃগী আয়ত্তে আনা সম্ভব। ওষুধের মাত্রা খুব সতর্কতার সঙ্গে নির্দিষ্ট করতে হবে—তাতেই ফিট হওয়া বন্ধ হতে পারে। ফিট বন্ধ হবাব পরও বেশ কয়েক বছর ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু একবার ওষুধ ব্যবহার করা শুরু হলে তা নিয়মিত ব্যবহার করে যেতেই হবে। শিশু নিজে থেকে নিয়মিত ওষুধ খেয়ে নেবে এটা যেন ধরে নেওয়া না হয়। বড়দের কাউকে এই ভার নিতে হবে। হঠাৎ ওষুধ বন্ধ হলে একটা গুরুতর ফিট চিরদিনের মত মস্তিষ্কের ক্ষতি করে দিতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে চিকিৎসকের নির্দেশ ঠিকমত পালনের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া চাই।

ওষুধ ছাড়াও দেখা দরকার রোগী স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে কিনা। তার খেলাধুলা বা স্কুলে যাওয়া যেন বন্ধ করে দেওয়া না হয়। বরং শিক্ষকদের বলে দেওয়া দরকার যে এমন শ্রমসাধ্য কাজ বা খেলা যেন তাকে দেওয়া না হয়, যাতে তার ফিট হলে বিপদের সম্ভাবনা কম থাকে। বিশেষ করে জলে সাঁতার কাটা, অথবা রাস্তায় সাইকেল চালানো ইত্যাদি। কারণ চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায়ও যে কোনো জায়গায়, যে কোনো অবস্থানে এই ফিট হতে পারে। টেলিভিশনের আলোর প্রতিক্রিয়ায় ফিট হওয়া সম্ভব। তাই রোগীকে টেলিভিশন না দেখতে দেওয়াই উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখতে হবে সে যেন বুঝতে না পারে যে অন্যান্য শিশুদের চেয়ে তার সঙ্গে আলাদা ব্যবহার করা হচ্ছে। বকাঝকা বা শাস্তি দেওয়ার কোন বাধা নেই, কেন না অতিরিক্ত সাবধানতা শিশুর মনকে আস্থাহীন করে তুলবে। জেনে রাখুন, অনেক বড় বড় আর বুদ্ধিমান লোকেরও মৃগী রোগ আছে। তাই আপনার শিশুর স্বাভাবিক হয়ে না ওঠবার কোন কারণই নেই।

আঘাত : সাধারণ একটু আধটু কেটে গেলে সে জায়গাটা পরিষ্কার জলে ধুয়ে দিলেই চলে। সংক্রামক শক্তি-নাশক কোন ওষুধ যেমন স্যাভলন (লিকুইড) জলে দিয়ে কাটার জায়গায় চারিদিক সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধুলে ভাল হয়। সামান্য ছড়ে যাওয়া বা কাটা-ছেঁড়ার ঘটনা হলে, সে জায়গাটা যদি এমন জায়গা না হয় যে নোংরা হবার এবং সংক্রমণের সম্ভাবনা আছে, তবে সেখানটা খোলা রাখলেই চলে। বাঁধতে হবে না। দুপাশ ফাঁক হয়ে যাওয়া গভীর কাটা হলে এবং রক্তক্ষরণ যদি খুব বেশী হয়, বিশেষত মাথার খুলিতে সে রকম কেটে গেলে চিকিৎসক দেখানো উচিত। কারণ সেখানকার চামড়া টান টান থাকে এবং চামড়ার গভীরে কাটলে সেই কাটা জায়গা তাড়াতাড়ি বুজে যায় না। সুতরাং সেখানে সেলাই প্রয়োজন হতে পারে। চিকিৎসক সেলাইর জন্য পরামর্শ করলে তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। সেলাই করলে সাময়িক ভাবে শিশুর কষ্ট হবে সত্যি, কিন্তু তাতে কাটা জায়গাটা তাড়াতাড়ি জোড়া লাগবে, সংক্রমণও ঘটবে না। কাটা গভীর হলে আর সংক্রমণের অবকাশ থাকলে শিশুর ট্রিপল অ্যানটিজেনের সম্পূর্ণ কোর্স নেওয়া থাকলেও চিকিৎসক ধনুষ্টংকার প্রতিরোধী টক্সয়েড-এর বুস্টার ডোজ নিতে

উপদেশ দিতে পারেন। সেইজন্যই রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে একটি রেকর্ড রাখার গুরুত্ব রয়েছে।

রক্তপাত: কোন ক্ষতস্থান থেকে কয়েক মিনিটের বেশী প্রচুর রক্তপাত হতে থাকলে সেই স্থান উঁচু করে ধরে ক্ষতস্থান যে কোন পরিষ্কার কাপড় দিয়ে খুব চেপে ধরতে হবে। কোনো নোংরা স্থানে পড়ে গিয়ে রক্তপাত হলে সেই ক্ষতস্থান ভালোভাবে ধুয়ে দিতে হবে। তারপর ক্ষতের ওপর পরিষ্কার কাপড় ঢাকা দিয়ে, সম্ভব হলে ক্ষত জায়গার দুইদিকের চামড়া একত্র করে মিনিট পাঁচ ধরে খুব চেপে রাখতে হবে। ক্ষতস্থান থেকে এরপরেও যদি রক্ত চুয়াতে থাকে, তবে একটুকরো পরিষ্কার কাপড় কয়েক ভাঁজে ভাঁজ করে ক্ষতস্থানে রেখে অপর একটা লম্বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে খুব চেপে আঁট করে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে হবে। এঁটে থাকা কাপড়ের প্যাডটি ক্ষতের ওপর প্রচুর চাপ দেবে এবং এই পদ্ধতিতে রক্তপাত বন্ধ হবে। এর পরেও যদি রক্ত ঝরে, তবে শিশুকে চিকিৎসকেয় নিকট নিয়ে যেতে হবে।

পুড়ে যাওয়া: শিশুর দেহের কোন জায়গা পুড়ে গেলে বা গরম জল অথবা বাষ্পে ছেঁকা লাগলে এবং ঘটনাটি ঘটার ঠিক সময়টিতে বড়রা কেউ উপস্থিত থাকলে তাঁদের উচিত প্রথমেই সেখানটায় বরফ জল লাগানো। বরফ জল কাছাকাছি না থাকলে অন্তত ঠাণ্ডা লবণ-জল লাগানো উচিত। এতে জ্বালা কম হবে। ঘটনাটা ঘটার ঠিক সময়টিতে উল্লিখিত ব্যবস্থা নিতে পারলে পোড়ার ক্ষতকেও সীমিত করবে। তেল বা মালিশ কখনও লাগাতে নেই এবং মালিশ করতে নেই। তাতে আহত স্থানের আরও ক্ষতি হবে। এই তেল বা মালিশ পরে ওঠানো কষ্টকর, আর এর কোন উপকারিতাও নেই। যদি ছোট ফোস্কা পড়ে, তার ওপরের চামড়া তুলে ফেলতে নেই, কারণ ফোস্কার চামড়ার তলায় যে তরল পদার্থ জমে, তা পুনরায় শুকিয়ে যাবে এবং বাইরের সংক্রমণকে প্রকৃতপক্ষে প্রতিরোধ করবে। অ্যান্টিসেপটিক লোশন যেমন এক পারসেণ্ট জেনশিয়ান ভায়োলেট লাগিয়ে দিলে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করবে এবং চামড়া তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে সাহায্য করবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি পোড়ার জায়গাটা খোলা রাখা যায়। তাতে ক্ষত

তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে এবং ক্ষতস্থানটি অক্ষত থাকবে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে যতবার তা খোলার চেষ্টা করা হবে, ততবারই নতুন শুকিয়ে যাওয়া জায়গাটাও আঘাত লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনেকটা জায়গা জুড়ে পুড়ে গেলে বরফ জল লাগিয়ে আর কিছু না করে চিকিৎসকের নিকট নিয়ে যাওয়া উচিত। পোড়ার ক্ষত যদি দূষিত মনে হয়, তবে লবণ জলে ভিজিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা উচিত। এর জন্য জলে লবণ দিয়ে (এক কাপ জলে ১ টেবিল-চামচ লবণ) ফুটিয়ে নিয়ে সেই জল ঠাণ্ডা করে তাতে কিছুটা পরিষ্কার কোমল কাপড় ডুবিয়ে নিঙড়ে নিয়ে পোড়া জায়গায় চাপা দিতে হবে। তারপর লবণ-ন্যাকড়াটা যথাস্থানে রাখার জন্য তার ওপরে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হবে এবং জায়গাটায় ফুটানো লবণজল ঠাণ্ডা করে মাঝে মাঝে লাগাতে হবে যাতে জায়গাটা ভিজে থাকে। ভিজে ব্যাণ্ডেজটার ওপর প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দিতে পারলে জায়গাটা অনেকক্ষণ ভিজেও থাকবে এবং বিছানাও ভিজবে না। পোড়ার জায়গা ব্যাণ্ডেজ করার প্রয়োজন না হলে আহত স্থান লবণ জলে বার বার ডোবালে ভাল হয়। লবণ বীজাণুকে নিহত করে ক্ষতস্থানটি পরিষ্কার রাখে। সর্বোপরি যেহেতু ব্যাণ্ডেজ করা হয় নি, সুতরাং বারবার ব্যাণ্ডেজ খোলার জন্য চামড়ায় টান লেগে শুকিয়ে যাওয়া জায়গায় আঘাত লাগবে না। ফোঁড়ার ওপর লবণজল লাগালে বা লবণজলের পটি বাঁধলে, ভাল ফল পাওয়া যায়।

মচকে যাওয়া ও হাড় ভেঙে যাওয়া : শিশু পড়ে গেলে পায়ের গোড়ালি অথবা হাতের কব্জা যদি মুচকে যায় এবং মচকানো জায়গাটা ফুলে উঠে ব্যথা হয়, তবে সংশ্লিষ্ট জায়গাটি কিছুক্ষণ উঁচু করে তুলে ধরতে হবে। ভিতরের লিগামেণ্ট এবং অংশুসমূহ ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাত ঘটলে আহত জায়গা উঁচু করে তুলে ধরার ফলে সেই রক্তপাত হ্রাস পাবে। কখনই আহত জায়গা মালিশ করা উচিত নয়। তাতে আঘাত আরও গুরুতর হবে। দৈবাৎ যদি হাড় ভেঙে গিয়ে থাকে, তবে তা মালিশ করার ফলে বিশেষ ক্ষতি হয়। অংশু দিয়ে তৈরী দুটি হাড়ের সন্ধিস্থলে আঘাত লাগার ফলে জায়গাটা মচকে যায়। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়াই তার একমাত্র চিকিৎসা। আঁট করে ব্যাণ্ডেজও সু-উপযোগী।

অনেক সময় এটা বোঝা কঠিন হয় যে আঘাতটা কেবলমাত্র মচ্‌কে যাবার জন্য না হাড়ই ভেঙে গেছে। সুতরাং ব্যথা গুরুতর হলে বা আঘাতপ্রাপ্ত স্থান খুব বেশী ফুলে গেলে চিকিৎসককে দেখানো উচিত। তিনি সন্ধিস্থলের এক্স্‌-রে তুলতে নির্দেশ দিতে পারেন।

হাড়ের ভাঙন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা গেলে নড়াচড়া করানো যথাসম্ভব প্রতিহত করা উচিত। সম্ভব হলে ভাঙা জায়গায় একটা কাঠের চটা (স্প্লিণ্ট) এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে স্প্লিণ্টটি সন্ধিস্থলের উপর-নীচ অতিক্রম করে এবং সেই অবস্থায় শিশুকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সৌভাগ্যবশত শিশুদের হাড় খুব নরম থাকে। প্রায়ই হাড় সম্পূর্ণ ভাঙে না, তা বেঁকে যায় বা আংশিক ভাঙে এবং দ্রুত সেরে যায়। হাড় ভেঙে গেলে শিশুকে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। দেরী করলে ক্রমশ ফোলা বেড়ে যাবে। তখন তাঁর পক্ষে হাড় সেট করা এবং প্লাস্টার করা কঠিন কাজ হবে।

মাথার আঘাত: বাচ্চারা বিছানা থেকে প্রায়ই গড়িয়ে পড়ে যায়। ছোট শিশুরাও টলমল করে হাঁটতে গিয়ে দুপদাপ পড়ে যায়। উভয় প্রকার পড়ে যাওয়াতেই তাদের মাথায় আঘাত লাগে। মায়েরা মাথায় আঘাত লাগলে শিশুদের জন্য উদ্বিগ্ন হন। কারণ মাথার আঘাত গুরুতর হতে পারে, তাঁরা শুনেছেন। এবং তাঁদের উদ্বিগ্ন হওয়া এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নয়।

মাথায় আঘাত লাগলে সেই জায়গাটায় ঠাণ্ডা কিছু লাগাতে হবে সর্বপ্রথমে। তাতে চামড়ার নীচের রক্তপাত বন্ধ করবে এবং ফোলা কমাবে। শিশুকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে কিছু সময়। শিশু যদি বমি করে বা তাকে আচ্ছন্ন দেখায়, তৎক্ষণাৎ চিকিৎসককে দেখানো উচিত। কিন্তু প্রাথমিক ভীতি ও ব্যথা কাটিয়ে উঠে বাচ্চা বা শিশু যদি একটু পরেই আবার খেলা করে, খায় দায় এবং স্বাভাবিকভাবে ঘুমায়, তবে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। চঞ্চল শিশুরা তো কতবার পড়ে এবং মাথায় ব্যথা পায়। আর সেটাই তার স্বাভাবিকতা।

নাক থেকে রক্ত-পড়া: দুর্ভাগ্যবশত কোনও কোনও শিশুর প্রায়ই নাক থেকে রক্ত পড়ে। নাকের মধ্যে কয়েকটি বড় রক্তবাহী

শিরার জন্য এটা হতে পারে। রক্তপাত অবস্থায় শিশুকে শান্তভাবে বসিয়ে মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখতে হবে যাতে প্রবাহিত রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় নাকের ভিতরে চলে না গিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। যদি তখন শিশু শুতে চায়, তাকে কাত করে শোয়াতে হবে যাতে রক্ত তার নাককে অবরুদ্ধ না করে বাইয়ে ঝরতে পারে। নাকের এবং ওপরের ঠোঁটের চারিদিকে ঠান্ডা কিছু লাগাতে হবে। এতে রক্তবাহী শিরা সংকুচিত হয়ে রক্ত-পড়া বন্ধ হতে সাহায্য করবে। রক্ত-বন্ধ-করা নাকের কোন ড্রপ থাকলে তাতে এক টুকরো তুলো ভিজিয়ে দিয়ে নাকের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে শিশুকে মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে বলতে হবে। যদি বার বার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, তবে তাকে বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করানো দরকার। তিনি শিশুর নাকের রক্তবাহী শিরাকে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা কটারাইজ বা সঙ্কুচিত করে দিতে পারেন। অন্য কোনও কারণে বার বার রক্ত পড়ে কিনা, সে সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু নাকের ঠিক নীচেকার শিরা থেকেই রক্তপাত হয়, তাই রক্ত বন্ধ হবার পর অন্তত ১০ মিনিট নাক টিপে রাখা উচিত।

দশম অধ্যায়

পুষ্টির উপকরণ

শরীরের বৃদ্ধি এবং সজীবতার জন্য প্রোটিন, শর্করা ও চর্বির মাধ্যমে খাদ্য শরীরে ক্যালরি সরবরাহ করে। দেহ সুস্থ ও সবল রাখার জন্য এবং দেহের হাড় ও রক্ত বৃদ্ধি করার জন্য শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও খাদ্যই যোগান দেয়। একটি বাড়ন্ত শিশুর একটি পরিণত বয়স্ক মানুষের থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয় কারণ তাদের পুষ্টির প্রয়োজন শুধুমাত্র শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য নয় শরীরের বৃদ্ধির জন্যও প্রয়োজন। যদি একটি শিশুকে ক্রমশ সুষম খাদ্যের সাহায্যে প্রয়োজনীয় ক্যালরি দেওয়া যায়, তবে সে তা থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন গ্রহণ করতে পারে।

ক্যালরি: শক্তি পরিমাপের একক। ক্যালরিপূর্ণ খাদ্য বলতে আমরা সেই পরিমাণ তাপ বা খাদ্যশক্তিকে বুঝি যা পরিপাচ্য হওয়ার পরে শরীরে সরবরাহ হয়। এই অধ্যায়ের শেষে নানাবিধ খাদ্যের পুষ্টিকর মান সম্পর্কে একটি তালিকা দেওয়া হল যা হতে আমরা প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিগত মান জানতে পারি। আমাদের দেহে চর্বি শর্করা এবং প্রোটিন অপেক্ষা দ্বিগুণ ক্যালরি যোগান দেয়। সেজন্য অপুষ্ট শিশুর খাদ্যে অতিরিক্ত তেল বা মাখন দেওয়া প্রয়োজন এবং অতিপুষ্ট শিশুর খাদ্যে অতিমাত্রায় চর্বি না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রথম বৎসরে শিশুর প্রতি কি. গ্রা. ওজন বাড়ানোর জন্য ১২০ ক্যালরিপূর্ণ খাদ্য প্রয়োজন। এক বৎসরের শিশুর সারাদিনে ১০০০ ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন এবং পরবর্তী প্রতি বৎসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১০০ ক্যালারি করে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। এইভাবে ৪ বৎসরের শিশুর সারাদিনে ১৩০০ ক্যালরির প্রয়োজন হয়। একজন সাধারণ কর্মঠ স্ত্রীলোকের সারাদিনে ১৯০০ থেকে ২০০০ ক্যালরি এবং একজন পুরুষের ৩০০০ ক্যালরির প্রয়োজন। সুতরাং, এটা

সহজেই অনুমেয় যে একটি এক বৎসরের শিশুর তার মায়ের খাদ্যের অর্ধেক পরিমাণ এবং তার বাবার খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। একটি শিশুর পক্ষে একবারে বা দুবারে বেশী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব নয় তাই তাকে বারে বারে সহজপাচ্য খাদ্য খাওয়ানো উচিত। বাড়ন্ত শিশুকে কি কি খাদ্য খাওয়ানো যেতে পারে তা অধ্যায়ের শেষের খাদ্য তালিকা হতে সহজেই অনুমান করা যাবে।

প্রোটিন : শরীরের বৃদ্ধির জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন। একটি শিশুর একটি পরিণত বয়সের লোক অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী প্রোটিনের প্রয়োজন, কারণ তার শরীরের পেশী, হৃদযন্ত্র, যকৃৎ, কিডনী ও রক্ত বৃদ্ধি করার জন্য এটি একান্তই প্রয়োজনীয়। একটি শিশুর প্রতি কি.গ্রা. দেহের ওজন বৃদ্ধির জন্য ২ গ্রাম পরিমাণ প্রোটিন এবং একটি কিশোরের ১½ গ্রাম প্রোটিনের আবশ্যক হয়। পরিমাণ অল্প হলেও শরীরের জন্য প্রোটিন একান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ।

মাতৃদুগ্ধে প্রয়োজনীয় প্রোটিন থাকে যা শিশু সহজেই গ্রহণ করতে পারে। গরুর দুধে যদিও বাছুরের উপযোগী প্রোটিন থাকে কিন্তু সদ্যোজাত মানবশিশুর পক্ষে অতিরিক্ত প্রোটিনসমৃদ্ধ।

যে প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড সমৃদ্ধ তাকে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন বলা হয়। অ্যামিনো অ্যাসিড দ্বারাই প্রোটিন গঠিত হয়। প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড বলতে আমরা সেই অ্যাসিডকেই বুঝি যা দেহে তৈরী হয় না এবং সেজন্য খাদ্য তালিকায় একে সংযোজন করা হয়। জৈব প্রোটিন যেমন ডিম, মাছ ও মাংসে প্রচুর পরিমাণে অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে এবং এটি প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনের উৎস।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না। সবজী, খাদ্যশস্য এবং ডালে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে প্রোটিন থাকে এবং এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন পর্যায়ভুক্ত। যদি ডিমের প্রোটিনকে আমরা আদর্শ খাদ্য হিসাবে স্বীকার করি (যেহেতু এটি প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডপূর্ণ) তা হলেও আমাদের নানারকম খাদ্যশস্য এবং ডাল গ্রহণ করা উচিত কারণ এগুলোও আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে। যেহেতু আমরা

খাদ্যশস্য, সবজী এবং ডাল মাছ বা মাংস অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে গ্রহণ করি তাই একজন নিরামিষাশী ব্যক্তি ও একজন আমিষাশী ব্যক্তি উভয়েই সমান স্বাস্থ্যবান। কারণ উভয়েই তাদের খাদ্যদ্রব্য হতে শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন সংগ্রহ করেন।

মাংসজাতীয় খাদ্যে ২০ শতাংশ, খাদ্যশস্য যেমন চাল, আটা ইত্যাদিতে ১০ শতাংশ এবং ডাল, মটর ইত্যাদিতে ২০ শতাংশ প্রোটিন থাকে। সয়াবীনে ৪০ শতাংশ প্রোটিন থাকে, এটি সর্বাপেক্ষা প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং বর্তমানে নানারকমভাবে রান্না করে খাওয়া হয়।

চর্বি: প্রোটিন ও শর্করা অপেক্ষা দ্বিগুণ ক্যালরিপূর্ণ খাদ্য। খাদ্যে মাখন, ঘি ও তেল ইত্যাদি চর্বিজাতীয় পদার্থ মিশ্রিত করলে ক্যালরির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং ত্বক সুস্থ রাখার জন্য অল্প পরিমাণে চর্বির প্রয়োজন হয়। জৈব চর্বি যেমন মাখন ও ঘি সম্পৃক্ত চর্বিজাতীয় অ্যাসিড এবং এগুলো অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত কারণ অতিরিক্ত চর্বি গ্রহণে বার্ধক্যে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ জাতীয় রোগ দেখা দেয়। উদ্ভিজ্জ চর্বি বা তেল যেমন বাদাম তেল, সর্ষের তেল ও সূর্যমুখী তেলে অসম্পৃক্ত চর্বিজাতীয় অ্যাসিড বেশীমাত্রায় থাকে এবং এতে উচ্চ রক্তচাপজনিত অসুখ হয় না। সেজন্য এই তেল রান্নায় ব্যবহৃত হয়।

শর্করা: ইহা অতি দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি করে এবং আমাদের দেহে প্রয়োজনীয় ক্যালরির অধিকাংশই সরবরাহ করে। যেহেতু, শিশুরা মিষ্টি পছন্দ করে তাই অতিপুষ্ট শিশুদের মিষ্টি না খাওয়ানোই ভালো।

ক্যালসিয়াম: হাড় এবং দাঁতের বৃদ্ধি ও মজবুত করার জন্য ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন। একটি শিশু দুধের মাধ্যমে প্রয়োজনের বেশী ক্যালসিয়াম পায় সেজন্য শিশুকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' খাওয়ানোর প্রয়োজন হয়, যা শরীরে ক্যালসিয়ামকে রাখতে সহায়তা করে এবং সেই শিশুকে আর কোনও ক্যালসিয়াম জাতীয় পদার্থ খাওয়ানো উচিত নয়।

লৌহ: লৌহের অভাবে শরীরে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। গরুর দুধে আয়রন খুব কম থাকে কিন্তু মাতৃদুগ্ধে এটা প্রচুর পরিমাণে থাকে। শুধুমাত্র যে সব শিশু গরুর দুধ খায় তাদের আয়রন

জাতীয় পদার্থ খাওয়ানো উচিত। ডিমের কুসুম, মাংস, লিভার ও শাক সবজী আয়রনের উৎস।

ভিটামিন : শরীরের পেশী সুস্থ রাখার জন্য স্বল্প পরিমাণে ভিটামিনের প্রয়োজন হয়। ভিটামিন অতিরিক্ত গ্রহণ করা ক্ষতিকারক, সেজন্য শিশুকে ডাক্তারের নির্দেশ মতো ভিটামিন খাওয়ানো উচিত। অধিকাংশ মায়েদেরই ধারণা যে বাচ্চার বৃদ্ধির সহায়ক হলো একটি ভালো বলকারক ঔষধ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভিটামিন সে রকম কোনও কাজ করে না। শুধুমাত্র পর্যাপ্ত ক্যালরিযুক্ত খাদ্যই শিশুর বৃদ্ধির সহায়ক।

ভিটামিন 'এ' : দুধ বা দুধ জাতীয় পদার্থ, ডিম, শাকসবজী যেমন পুদিনা পাতা বা ধনে পাতা, হলদে রংয়ের ফল, গাজর, আম ও পেঁপেতে ভিটামিন 'এ' থাকে। চক্ষু রক্ষার জন্য, ত্বক ও অন্যান্য অঙ্গকে সুস্থ রাখার জন্য ইহা অপরিহার্য। ইহার অভাবে রাতকানা, চর্মরোগ, ব্রঙ্কাইটিস ও অন্যান্য প্রস্রাবজনিত সংক্রামক রোগ দেখা দেয়।

ভিটামিন 'সি' : টাটকা ফল বিশেষত কমলা, মুসাম্বি, পেয়ারা, টমেটো ও শাকসবজীতে ভিটামিন 'সি' থাকে। সূর্যকিরণে ও অতিসিদ্ধ করলে ই-র গুণ নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য এই সমস্ত জিনিস বেশী সিদ্ধ না করে টাটকা খাওয়াই ভালো।

ভিটামিন 'ডি : রিকেট হতে রক্ষা করার জন্য ও হাড়ের বৃদ্ধির জন্য ই-র প্রয়োজন। অধিকাংশ পিতা-মাতা মনে করেন যে ক্ষীণকায় শিশুরাই রিকেটে ভোগে। প্রকৃতপক্ষে ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবে এই রোগ দেখা দেয় এবং এতে হাড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নষ্ট হয়ে হাড় নরম হয়ে যায়। যদি কোনও শিশু বহুদিন ধরে আমাশয় রোগে ভোগে এবং খাদ্যের ভিটামিন হজম করতে না পারে তবে সেই শিশু একই সঙ্গে রিকেট এবং ভিটামিন 'এ'র অভাবজনিত রোগে ভুগতে পারে। ডিমের কুসুম ও দুধে ভিটামিন 'ডি' থাকে। সূর্যকিরণের সাহায্যে এটি ত্বকে তৈরী হয়।

ভিটামিন—'বি' : অনেক ভিটামিনের সমন্বয়ে ভিটামিন 'বি' তৈরী হয়। খাদ্য ডাল ও সবজীতে ইহা পাওয়া যায়। বেশী সিদ্ধ করলে অথবা সিদ্ধ করার পর সেই জল ফেলে দিলে এই ভিটামিনের গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

বিভিন্ন বয়সে শিশুর খাদ্য তালিকা

জন্ম হতে ৩।৪ মাস পর্যন্ত :

জন্মের পর হতে প্রথম কয়েক মাস শিশুকে শুধুমাত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর দুধ খাওয়ানো উচিত। দুধ খাওয়ানোর সময় সকাল ৬টা, ৯টা, দুপুর ১২টা, বিকাল ৩টে, সন্ধ্যা ৬টা, রাত্রি ৯টা এবং রাত্রে আরও একবার ২ মাস বয়েস পর্যন্ত খাওয়ানো উচিত।

১ মাস বয়েস থেকে ফলের রস সকাল ৯টা অথবা ১২টার সময় শিশুকে খাওয়ানো উচিত। এরপর থেকে শিশুকে মাল্টি ভিটামিন দেওয়া উচিত।

৩ মাস বয়েস থেকে খাদ্যশস্য, সুজি বা সাগু দুধ এবং জলের সাহায্যে ফুটিয়ে খাওয়ানো উচিত। তার ২/৪ সপ্তাহ পরে চটকানো পাকা কলা বা আম শিশুকে খাদ্যশস্যের সঙ্গে খাওয়ানো উচিত। এর পর থেকে সুসিদ্ধ ডিমের কুসুম শিশুকে খাদ্যশস্যের সঙ্গে খাওয়ানো উচিত।

শিশুর খাদ্য তালিকার সংক্ষিপ্ত রূপ

৫ মাস বয়সে :

ঘুম থেকে ওঠার পর	—	৬ আউন্স দুধ
সকাল ৯টায়	—	খাদ্যশস্য দুধ ও ফল যেমন আম ও কলার সঙ্গে।
সকাল ১১টা	—	কমলার রস।
দুপুরবেলা	—	দুধ।
বিকাল ৩টে	—	দুধ।
সন্ধ্যা ৬টা	—	দুধ ও ডিম সহযোগে খাদ্যশস্য
রাত্রি ৯টা—১০টা	—	দুধ।

৭।৮ মাস বয়সে :

শিশুকে ভাত, ডাল ও সবজী খাওয়ানো উচিত।

৯।১০ মাস বয়সে :

মাংস ও মাছ খাওয়ানো যেতে পারে এবং আস্তে আস্তে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঘুম থেকে ওঠার পর	—	৬/৮ আউন্স দুধ।
সকাল ৯টা	—	দুধ, ডিমের কুসুম, চটকানো কলা বা আম সহযোগে খাদ্য-শস্য অথবা, পাঁউরুটি মাখন বা ঘরে তৈরী রুটি।
দুপুর	—	এক বাটি ভাত বা ২টো চাপাটি, ½ বাটি ডাল, টাটকা সবজী, মাছ, খণ্ড খণ্ড মাংস বা দই।
দুপুর ৩টা—৪টা	—	৬/৮ আউন্স দুধ, পাঁউরুটি মাখন বা ঘিয়ে তৈরী চাপাটি বা সুজির হালুয়া বা একটা কলা।
সন্ধ্যা ৬টা—৭টা	—	ভাত বা চাপাটি বা খিচুড়ি, সিদ্ধ সবজী তেল বা মাখনের সহযোগে। ½ বাটি ডাল, পুডিং, পায়েস, ক্ষীর বা কাস্টার্ড বা ৬/৮ আউন্স দুধ।

———

শিশু বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শ্রীমতী ইন্দিরা ভট্টাচার্য
দেশের নানা জায়গায় বড় বড় সরকারী
হাসপাতালে কাজ করেছেন।
শিশুপালন সম্পর্কে তাঁর
দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা
বহু রুগ্ন শিশু ও প্রসূতিকে সহজ ও সরল
পথের ইঙ্গিত দিয়েছে।
ডাঃ ভট্টাচার্য এম. বি. বি. এস. হ'ন
ভেলোর থেকে। পরে এম. ডি. হ'ন
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
১৯৫৮ সাল থেকে তিনি
শিশু চিকিৎসায় নিযুক্ত রয়েছেন।
এই বইটি তাঁর দীর্ঘদিনের
অভিজ্ঞতার ফসল।
বর্তমানে তিনি কলকাতার
ইন্সটিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন
অ্যাণ্ড রিসার্চ-এ ভাবী জননীদের
চিকিৎসা পরিচালনা করছেন।
এছাড়া তিনি
ঐ ইন্সটিটিউটে শিশু চিকিৎসা বিষয়ের লেকচারার।
ডাঃ ভট্টাচার্যের সদ্যপ্রয়াত স্বামী
মনোময় ভট্টাচার্য
ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের
একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন।
তিনি দুই পুত্রের জননী।